WWW.BDBANGLA.COM

rohan_ahmed (mamun)

Plz enjoy our forum & make new friend.....

WWW.BDBANGLA.COM

WWW.BDBANGLA.COM

কায়ীরা কোমরে হাত দিয়ে খানিকটা অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ভাসমান দ্বীপটির কিনারায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল। সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউ মৃদু শব্দ করে ভাসমান দ্বীপের পাটাতনে আছড়ে পড়ছে, কায়ীরার দৃষ্টি এই সবকিছু ছাড়িয়ে বহুদূরে কোথাও আটকে আছে। তাকে দেখে মনে হয় না সে নির্দিষ্ট করে কিছু দেখছে, চারিদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু সমুদ্রের নীল পানি, আর কোনো ব্যতিক্রম নেই, বৈচিত্র্য নেই তাই কাউকে নির্দিষ্ট একটা ভঙ্গিতে একদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকলে এক ধরনের অসৃস্তি হয়।

নিহনেরও একটু অসৃস্তি হচ্ছিল, সে সমুদ্রের পানি থেকে নিজের পা দুটি ওপরে তুলে নিচু গলায় ডাকল, 'কায়ীরা।'

কায়ীরা ঠিক শুনতে পেল বলে মনে হলো না। নিহন তখন গলা আরেকটু উঁচিয়ে ডাকল, 'কায়ীরা।'

কায়ীরা বলল, 'শুনছি। বলো।'

'তুমি কী দেখছ?'

কায়ীরা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'জানি না।'

'তাহলে এভাবে দূরে তাকিয়ে আছ কেন?'

কায়ীরা ঘুরে নিহনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসার ভঙ্গি করল। কায়ীরার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, যখন তার বয়স কম ছিল তখন সে নিশ্চয়ই অপূর্ব সুন্দরী ছিল। এই জীবনটিতে তার ওপর দিয়ে ঝড়-ঝাপটা খুব কম যায়নি। কঠিন একটি জীবন, দুঃখ-কষ্ট আর সমুদ্রের লোনাপানিতে তার সৌন্দর্যের কমনীয়তাটুকু চলে গিয়ে সেখানে এক ধরনের বিষাদ পাকাপাকিভাবে স্থান করে নিয়েছে। কায়ীরার মাথায় কাঁচাপাকা চুল, তামাটে রোদেপোড়া গায়ের রঙ এবং সুগঠিত শরীর। মাথার চুল পেছনে শক্ত করে বাঁধা, পরনে সামুদ্রিক শ্যাওলার একটা সাদামাটা পোশাক, গলায় হাঙরের দাঁত দিয়ে তৈরি একটা মালা। এই অতি সাধারণ পোশাকেও কায়ীরাকে কেমন জানি অসাধারণ দেখায়।

কায়ীরা বলল, 'আমার মনে হয় একটা টাইফুন আসছে।'

নিহন চমকে উঠে কায়ীরার দিকে তাকাল, বলল, 'কী বলছ তুমি?'

কায়ীরার মাথা নাড়ল, বলল, 'হ্যাঁ। এটা টাইফুনের সময়। সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা বাড়ছে–বছরের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সময়।'

নিহল অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে একবার সমুদ্রের দিকে আরেকবার আকাশের দিকে তাকাল, তারপর শুকনো গলায় বলল, 'তুমি কেমন করে বুঝতে পারলে? কী দেখে বুঝতে পারলে?'

কায়ীরা মাথা নাড়ল, বলল, 'জানি না। বাতাসে কিছু একটা হয়, পানিতে কিছু একটা থাকে।'

'আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।'

'তুমি যখন আমার মতো বুড়ি হবে তখন তুমিও বুঝতে পারবে।'

নিহন বলল, 'তুমি মোটেও বুড়ি না। তুমি তুমি–' নিহন বাক্যটা শেষ করতে পারল না।

কায়ীরা জিজ্ঞেস করল, 'আমি কী?'

'তুমি এখনো অনেক সুন্দরী।'

কায়ীরা শব্দ করে হেসে বলল, 'তোমার বয়স কত হলো নিহন?'

'সতেরো।'

'সতেরো? আমার ছেলেটি বেঁচে থাকলে সে এখন তোমার বয়সী হতো।'

নিহল মাথা নাড়ল, বলল, 'হ্যাঁ।' ভাসমান দ্বীপের সবাই জানে কায়ীরার পাঁচ বছরের দুরন্ত ছেলে আর তার দুঃসাহসী বাবা একটা খ্যাপা হ্যামার হেড হাঙরের হাতে মারা গেছে। কেউ সেটা নিয়ে কথা বলে না। কায়ীরা হাসিমুখে বলল, 'তোমার বয়স যখন সতেরো তখন তোমার কী করা উচিত জানো?'

'কী?'

'তোমার বয়সী একটা সুন্দরী মেয়ে খুঁজে বের করা। আমাদের এই দ্বীপে অনেকে আছে।'

নিহন কেন জানি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল, ইতস্তত করে বলল, 'আমি আসলে ঠিক এভাবে বলছিলাম না।'

'তাহলে কীভাবে বলছিলে?'

'শুধু চেহারা দিয়ে তো সৌন্দর্য হয় না। সৌন্দর্যের জন্য আরও অনেক কিছু লাগে।'

'আর কী লাগে?'

WWW.BDBANGLA.COM

'সাহস লাগে, বুদ্ধি লাগে, অভিজ্ঞতা লাগে। তা ছাড়া মানুষটাকে আরও ভালো হতে হয়। তোমার সবকিছু আছে।'
কায়ীরা কিছু না বলে খানিকটা কৌতুকের সঙ্গে এই কমবয়সী ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইল। ভাসমান দ্বীপের এই বয়সী ছেলে-মেয়ে থেকে সে যে একটু আলাদা এটা সে আগেও লক্ষ করেছে। কায়ীরা জিজ্ঞেস করল, 'আমার সব কিছু আছে? সব?'
'না, ঠিক সব কিছু নেই–'
'কী কী নেই?'
'তোমার পরিবার নেই। তুমি একা থাকো–কিন্তু সেটা তো ইচ্ছে করে। তুমি চাইলেই তোমার একটা পরিবার থাকত। আমাদের ভাসমান দ্বীপের সব ব্যাটাছেলে তোমাকে বিয়ে করার জন্য ব্যস্ত–'
কায়ীরা হাত নেড়ে বলল, 'থাক, অনেক হয়েছে! কোন কোন ব্যাটাছেলেরা আমার পেছনে ঘুর ঘুর করে সেটা তোমার মুখ থেকে শুনতে হবে না। সেটা আমিই ভালো করে জানি। এখন এই ব্যাটাছেলেদের কাজে লাগাতে পারলে হয়–'
'তুমি টাইফুনের কথা বলছ?'
'হ্যাঁ।' কায়ীরা ঘুরে তাদের ভাসমান দ্বীপটার দিকে তাকাল, এটি প্রায় পাঁচ কিলোমিটার লম্বা আর দুই কিলোমিটার চওড়া। এখানে সব মিলিয়ে প্রায় দুই হাজার মানুষ থাকে। বড় ধরনের টাইফুন এলে সবাইকে পানির নিচে আশ্রয় নিতে হয়। সবকিছু নিয়ে পানির নিচে যাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়।
'কায়ীরা, তোমার কী সত্যিই মনে হচ্ছে টাইফুন আসবে? আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার–'
'আর দুই-একদিনে এটা ঝকঝকে পরিষ্কার থাকবে না। ব্যারোমিটারের পারদ নিচে ঝাপ দেবে–'
নিহন মাথা নেড়ে বলল, 'তুমি কেমন করে এটা আগে থেকে বুঝতে পারো আমি বুঝি না!'
কায়ীরা বলল, 'একসময়ে পৃথিবীতে হাজারো রকম যন্ত্রপাতি থাকত, সেগুলো বলতে পারত। এখন যন্ত্রপাতি নেই, তাই আগে থেকে অনুমান করতে হয়–'
'যন্ত্রপাতি নেই সেটা তো সত্যি নয়–' নিহন ইতস্তত করে বলল, 'যন্ত্রপাতি আছে। আমাদের কাছে নেই। স্থলমানবদের কাছে আছে।'
কায়ীরা ঘুরে নিহনের দিকে তাকাল, 'তোমার কি ধারণা, স্থলমানবেরা কোনো দিন এসে আমাদের বলবে, নাও এই যন্ত্রপাতিগুলো নাও?'
নিহন বলল, 'না, তা আমি বলছি না।'
'এই টাইফুন আমাদের জন্য যত বড় বিপদ, তার চেয়ে অনেক বড় বিপদ এই স্থলমানবেরা। আমরা যদি কোনো দিন পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই, তাহলে সেটা টাইফুনের জন্য হবে না, রোগ-শোক-মহামারীর জন্যে হবে না, সেটা হবে এই স্থলমানবদের জন্য! বুঝেছ? তারা কোনো একদিন এসে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।'
নিহন একটু অস্থির হয়ে বলল, 'কিন্তু কায়ীরা, আমি এই একটা জিনিস বুঝতে পারি না। আমরা যেরকম মানুষ তারাও ঠিক সেরকম মানুষ। কিন্তু তারা কেন আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইবে? এক সময়ে তো আমরা একসঙ্গে ছিলাম–'
'পৃথিবীটা পানির নিচে ডুবে সব হিসাব অন্য রকম হয়ে গেছে!'
নিহন মাথা ঘুরিয়ে সমুদ্রটির দিকে তাকায়, চারিদিকে শুধু পানি আর পানি। একসময় পৃথিবীতে মাটি ছিল। এখন নেই। সব এই সমুদ্রের নিচে তলিয়ে গেছে। ছিটেফোঁটা যেটুকু তলিয়ে যায়নি সেখানে স্থলমানবেরা থাকে। আর তারা থাকে সমুদ্রের পানিতে। তাদের জন্য একটা নতুন নাম হয়েছে, জলমানব। পৃথিবীটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে প্রায় দুই শত বছর আগে, জলমানব আর স্থলমানব!
কায়ীরা একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'যদি কখনো ঠিক করে এই পৃথিবীর ইতিহাস লেখা হয় তখন সেখানে কী লেখা হবে জানো?'
'কী?'
'সেখানে লেখা হবে এই পৃথিবীর সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে আমাদের টিকে থাকা! শুকনোতে থাকা স্বার্থপর মানুষগুলো ২০০ বছর আগে যখন আমাদের পানিতে ঠেলে দিয়েছিল তখন আমাদের টিকে থাকার কথা ছিল না। কিন্তু আমরা টিকে গিয়েছি।'
নিহন অন্যমনস্কের মতো মাথা নাড়ল, বলল, 'হ্যাঁ টিকে গিয়েছি। কিন্তু–'
'কিন্তু কী?'
'আমাদের কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞান নেই, প্রযুক্তি নেই–' 'কে বলেছে নেই?'

WWW.BDBANGLA.COM

স্থলমানবেরা কত কিছু করে। মহাকাশে রকেট পাঠায়। আকাশে উড়ে কত রকম আনন্দ-ফূর্তি–আর আমরা? আমরা শুধু কোনোভাবে বেঁচে আছি।'
কায়ীরা বিচিত্র একটা দৃষ্টিতে নিহনের দিকে তাকিয়ে রইল। নিহন বলল, 'কী হলো, তুমি কিছু বলছ না কেন?'
'আমি ইচ্ছে করলেই বলতে পারি। কিন্তু আমি নিজে থেকে বলতে চাই না। তোমার নিজেকে সেটা বুঝতে হবে। আমরা এমনি এমনি টিকে নেই নিহন, আমরা টিকে আছি আমাদের নিজস্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য। সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানটা কী জানো?'
'কী?'
'সেটা আমি তোমাকে বলব না। সেটা তোমাকে বের করতে হবে।'
নিহন মাথা চুলকে বলল, 'আমাদের ইলেকট্রিক জেনারেটর? অক্সিজেন টিউব? পানির পাম্পমেশিন?'
কায়ীরা মাথা নাড়ল, বলল, 'না। এগুলো ছোটখাটো ব্যাপার। এর চেয়ে অনেক বড় আবিষ্কার আমাদের আছে!'
'সেটা কী?'
কায়ীরা এক ধরনের রহস্যের ভাব করে বলল, 'সেটা আমি তোমাকে বলব না! তোমার নিজেকে বের করতে হবে?'
নিহন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কায়ীরা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এখন চলো, অনেক কাজ আছে। দেখি রিসি বুড়ো কী বলে!'

বিশাল একটা সামুদ্রিক কচ্ছপের খোলসের ভেতর রিসি বুড়ো গুটিসুটি মেরে বসেছিল। কায়ীরা আর নিহনের পায়ের শব্দ শুনে বলল, 'কে?'
কায়ীরা বলল, 'আমি রিসি বুড়ো। আমি আর নিহন।'
'নিহন? নিহনটা কে?'
'ক্রানার বড় ছেলে।'
'ও।' রিসি বুড়ো বিড় বিড় করে বলল, 'ক্রানার বাপ খুব সাহসী মানুষ ছিল। স্থলমানবের সঙ্গে একবার একা যুদ্ধ করেছিল। একেবারে ফাটাফাটি যুদ্ধ।'
নিহন সেই গল্প অনেকবার শুনেছে। কে জানে তাকেও কোনো দিন তার পূর্বপুরুষের মতো স্থলমানবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে কি না!
কায়ীরা বলল, 'বাতাসটা টের পাচ্ছো রিসি বুড়ো?'
'বুড়ো হয়েছি, আগের মতো টের পাই না। তবু মনে হচ্ছে গোলমাল।'
'মনে হয় টাইফুন আসছে।'
রিসি বুড়ো মাথা নাড়ল, বলল, 'হ্যাঁ। মনে হয় বড় একটা আসছে।'
'বছরের শুরুতেই এ রকম, পরে কী হবে?'
রিসি বুড়ো বিড় বিড় করে বলল, 'সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেছে। কোনো কিছুর আর হিসাব মেলে না!'
'আমাদের তো কাজ শুরু করে দিতে হবে।'
'হ্যাঁ, দিতে হবে।'
'সবাইকে ডাকব?'
রিসি বুড়ো নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ডাকো।'
কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাসমান দ্বীপের মানুষেরা রিসি বুড়োর কাছে হাজির হতে শুরু করে। প্রত্যেকটা পরিবার থেকে একজন আসার কথা, যারা মাছ ধরতে বা অন্য কাজে সমুদ্রে গিয়েছে তারা আসতে পারেনি। তারপরও প্রায় দুই শ পুরুষ আর মহিলা হাজির হয়েছে। যারা এসেছে তারা কেউই বসে নেই, মেয়েরা সামুদ্রিক শ্যাওলার সুতো দিয়ে কাপড় বুনছে। পুরুষেরা পাথরের টুকরোয় হাঙরের দাঁত ঘষে ধারালো করে তুলতে তুলতে নিচু গলায় কথা বলছে। তাদের অনেকেরই উদোম শরীর, শক্ত পেশিবহুল শরীর, রোদে পুড়ে তামাটে।
রিসি বুড়ো তার শীর্ণ হাত ওপরে তুলতেই সবাই কথা বন্ধ করে মাথা তুলে তাকাল। রিসি বুড়ো গলা উঁচিয়ে বলল, 'তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ আমি তোমাদের কেন ডেকেছি।'
উপস্থিত মানুষগুলোর মধ্যে একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে আবার থেমে গেল। রিসি বুড়ো তার নিষ্প্রভ চোখ দুটো দিয়ে সবাইকে দেখার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'কেন ডেকেছি তোমরা জানো?'
কাছাকাছি বসে থাকা একটি মেয়ে তার কাপড় বোনার কাঁটা দুটো পাশে সরিয়ে রেখে বলল, 'নেপচুনের

WWW.BDBANGLA.COM

দোহাই-টাইফুন আসছে বলার জন্য ডাকোনি তো?'
'হ্যাঁ, টাইফুন আসছে, কিন্তু আমি সে জন্য তোমাদের ডাকিনি। আমি তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলার জন্য তোমাদের ডেকেছি।'
কায়ীরা একটু অবাক হয়ে রিসি বুড়োর দিকে তাকাল। আট থেকে দশ মাত্রার টাইফুন থেকে গুরুত্বপূর্ণ কী কথা তার বলার আছে?
রিসি বুড়ো তার শীর্ণ শরীরটি সোজা করে বসার চেষ্টা করে বলল, 'তোমরা সবাই জানো, আমার বয়স হয়েছে। চোখ দিয়ে বলতে গেলে কিছু দেখি না। ভালো করে শুনতেও পাই না। সহজ কথাটাও মনে থাকে না, ভুলে যাই। তোমাদের দেখলে চিনতে পারি না। বুঝতে পারছি অতল সমুদ্রের ডাক আসছে।'
রিসি বুড়ো নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য এক মুহূর্ত থামল, সবার ভেতরে এক মুহূর্তের জন্য একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে আবার থেমে গেল। বুড়ো রিসি মাথা তুলে বলল, 'প্রায় বিশ বছর আগে ক্রাতুল মারা যাওয়ার পর আমি তোমাদের দায়িত্ব নিয়েছিলাম। দুঃখে-কষ্টে সুখে-দুঃখে আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম। আমি তোমাদের কথা শুনেছি, তোমরা আমার কথা শুনেছ।
গত কিছুদিন থেকে আমি বুঝতে পারছিলাম এখন আমার বিদায় নেওয়ার সময় হয়েছে। অন্য একজনকে এখন তোমাদের নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে। কাকে সেই দায়িত্ব দেওয়া যায় আমি সেটা বুঝতে পারছিলাম না। আমি মনে মনে সেই মানুষটিকে খুঁজছিলাম। কিন্তু খুঁজে পাচ্ছিলাম না।'
রিসি বুড়ো এক মুহূর্তের জন্য থেমে তার নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকায়, তারপর গলায় একটু জোর দিয়ে বলল, 'আমি অল্প কিছুক্ষণ আগে সেই মানুষটিকে খুঁজে পেয়েছি। সেই মানুষটির কাছে আমার সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমি তোমাদের ডেকেছি।'
ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মানুষগুলো এবারে উত্তেজনায় হট্টগোল শুরু করে দেয়। রিসি বুড়ো সবাইকে থেমে যাওয়ার জন্য সময় দেয়। হট্টগোল এবং গুঞ্জন থেমে যাওয়ার পর রিসি বুড়ো আবার মুখ খুলল, বলল, 'পৃথিবীর স্থলমানবেরা যখন আমাদের সমুদ্রের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল, সবাই ভেবেছিল আমরা শেষ হয়ে যাব। আমরা শেষ হয়ে যাই নাই এবং এখন মনে হচ্ছে সমুদ্রের পানিতে বেঁচে থেকে আমরা একটা নতুন সভ্যতা তৈরি করতে যাচ্ছি। তার একটা কারণ, আমরা কখনো নেতৃত্ব নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হই না। যে নেতৃত্ব নেওয়ার যোগ্য আমরা তার হাতে সেটা তুলে দিই। আমি আজ সেই নেতৃত্বটি তোমাদের একজনের হাতে তুলে দেব। আমাদের জলমানবের ইতিহাস আর ঐতিহ্য অনুযায়ী তোমরা সবাই তাকে অভিনন্দন জানাও।'
চকচকে উত্তেজিত চোখে অনেকে উঠে দাঁড়িয়ে গেল, চিৎকার করে বলল, 'কে? কে? কে নতুন নেতা।'
রিসি বুড়ো ধীরে ধীরে সামুদ্রিক কচ্ছপের ফাঁকা খোলসটা থেকে বের হয়ে আসে, নিজের গলা থেকে জেড পাথরের মালাটি খুলে নিয়ে নরম গলায় ডাকল, 'কায়ীরা, তুমি সবার সামনে এসে দাঁড়াও।'
উপস্থিত মানুষগুলো উত্তেজনায় চিৎকার করতে থাকে, কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা কমবয়সী কয়েকটি মেয়ে কায়ীরাকে জড়িয়ে ধরে। কায়ীরা তাদের ভালোবাসার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে রিসি বুড়োর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।
রিসি বুড়ো সস্নেহে কায়ীরার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসো কায়ীরা। তোমার দায়িত্বটুকু বুঝে নাও।'
কায়ীরা নিচু গলায় বলল, 'জেড পাথরের এই মালাটা আমার গলায় পরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনটা অন্য রকম হয়ে যাবে।'
রিসি বুড়ো মাথা নাড়ল, বলল, 'হ্যাঁ কায়ীরা।'
'তুমি ঠিক করে পুরো ব্যাপারটা ভেবেছ? সত্যিই তুমি আমাকে দায়িত্ব দিতে চাও?'
'হ্যাঁ কায়ীরা। এই পুরো দ্বীপটিতে শুধু তুমিই এই টাইফুনের কথা বুঝতে পেরেছ। আর কেউ পারেনি।'
'নেতা হওয়ার জন্য সেটাই কী যথেষ্ট?'
'না কায়ীরা, সেটা যথেষ্ট না। আরও কী দরকার আমি সেটা জানি। আমি বিশ বছর থেকে সেটা করে আসছি।'
'তুমি নিশ্চিত, তুমি ভুল করছ না?'
'আমি নিশ্চিত কায়ীরা। তুমি জানো, গত বিশ বছরে আমি একবারও ভুল সিদ্ধান্ত নিইনি।'
'বেশ।' কায়ীরা নিঃশ্বাস ফেলে রিসি বুড়োর সামনে মাথা নিচু করল। রিসি বুড়ো তার গলায় জেড পাথরের মালাটি পরিয়ে দিয়ে শীর্ণ হাতে কায়ীরার মাথা স্পর্শ করে বলল, 'তুমি আমাদের জন্য নতুন সভ্যতার জন্ম দাও কায়ীরা।'
কায়ীরা ফিসফিস করে বলল, 'যদি সেটাই আমাদের ভবিষ্যৎ হয়ে থাকে তাহলে আমি সেটাই করব, রিসি বুড়ো।'
কায়ীরা এবারে ঘুরে সবার দিকে তাকাল। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তখন হাত নাড়ছে, চিৎকার করছে। সে হাত তুলতেই

WWW.BDBANGLA.COM

সবাই চুপ করে যায়। কায়ীরা একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমি কখনো ভাবিনি আমাকে এই দায়িত্ব নিতে হবে।'
কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা কমবয়সী একটা মেয়ে বলল, 'তুমি খুব চমৎকারভাবে এই দায়িত্ব পালন করবে, কায়ীরা।'
মধ্যবয়সী একজন মানুষ বলল, 'আমাদের সবার পক্ষ থেকে তোমাকে অভিনন্দন।'
'তোমাদের ধন্যবাদ।' কায়ীরা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'আমার এখন সম্ভবত তোমাদের উদ্দেশে কিছু একটা বলার কথা। আমি ঠিক জানি না, কী বলব! আজ থেকে কয়েক শ বছর আগে যখন মানুষেরা মাটির ওপরে থাকত, তখন পরিবার বলতে বোঝানো হতো বাবা-মা আর তার সন্তানেরা। সমুদ্রের পানিতে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা মানুষের জন্য পরিবার শব্দটা আরও ব্যাপক। এই ভাসমান দ্বীপের সব মানুষ মিলে আমরা একটি পরিবার। আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি, আমাদের এই পরিবারটিকে আমি বুক আগলে রক্ষা করব।'
সবাই হাত তুলে এক ধরনের আনন্দধ্বনি করল। কায়ীরা বলল, 'আমি জানি না, তোমরা টের পাচ্ছ কি না, সমুদ্রের আবহাওয়া খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। আমরা বোঝার আগেই এই টাইফুন এসে আমাদের আঘাত করবে। তাই আমার মনে হয়, আমরা আমাদের কাজ শুরু করি।'
সবাই মাথা নাড়ল। কায়ীরা নিহনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নিহন, তুমি দশজনকে নিয়ে এই মুহূর্তে বের হয়ে যাও। যারা গভীর সমুদ্রে গেছে তাদের ফিরে আসতে বলো।'
নিহন মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক আছে।'
কায়ীরা কমবয়সী একটা মেয়েকে বলল, 'ক্রিটিনা, তুমি ন্যাদা বাচ্চাগুলো একত্র করে পানির নিচে ওদের অক্সিজেন সাপ্লাই দেওয়ার ব্যবস্থাটা নিশ্চিত করো।'
ক্রিটিনা অবাক হয়ে বলল, 'ওরা আমাদের সঙ্গে থাকবে না?'
'থাকবে। কিন্তু নিজেদের অক্সিজেন সাপ্লাইসহ। আমি শিশুদের নিয়ে ঝুঁকি নেব না।' কায়ীরা ঘুরে মধ্যবয়স্ক রিওনকে বলল, 'রিওন, তুমি তোমার ইঞ্জিনিয়ার টিম নিয়ে এখনি পাম্পগুলোর কাছে যাও। দেখো, সেগুলো কাজ করছে কি না। তেলের সাপ্লাই ঠিক করো। দরকার হলে রিজার্ভ থেকে বের করো।'
'ঠিক আছে।'
কায়ীরা আরও কিছু একটা বলতে গিয়ে ঘুরে নিহনের দিকে তাকাল, বলল, 'নিহন, তুমি এক্ষুনি যাও। আমাদের হাতে সময় নেই। আমার কথা বিশ্বাস না হলে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ।'
নিহন আকাশের দিকে তাকাল, সত্যি সত্যি সেখানে ধূসর এক ধরনের মেঘ এসে জমা হচ্ছে। কেমন যেন থমথমে পরিবেশ। সে উঠে দাঁড়ায়, বলে, 'কায়ীরা, আমি যাচ্ছি, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।'

২.

কাটুস্কা নিঃশব্দে মনিটরটির দিকে তাকিয়েছিল। উপগ্রহ থেকে সরাসরি ছবি পাঠিয়েছে–সেই ছবিতে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের বুকে একটা টাইফুন তৈরি হচ্ছে। নীল সমুদ্রের ওপর সাদা মেঘের ঘূর্ণন, কী প্রচণ্ড শক্তি তার মধ্যে জমা হয়ে আছে! এটি সমুদ্রের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াবে, সমুদ্রের নীল পানিকে ওলটপালট করে দিয়ে ছুটে যাবে! কাটুস্কা মনিটর থেকে চোখ ফেরাতে পারে না, মনে হয় প্রকৃতি ভয়ঙ্কর ক্রোধে ফুঁসে উঠছে, এই ক্রোধের মধ্যে যে এক ধরনের সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে সেটি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।
ঘরের দরজায় কে জানি টুকটুক করে শব্দ করল। কাটুস্কা মনিটর থেকে চোখ সরিয়ে বলল, 'কে?'
দরজাটা একটু খুলে কাটুস্কার সমবয়সী একটি মেয়ে বলল, 'আমি, ক্রানা।'
'ও! ক্রানা, এসো, ভেতরে এসো।'
'তুমি একা একা বসে কী করছ? ভিডি টিউবে ভালো কিছু দেখাচ্ছে নাকি?'
'না না, সেসব কিছু না। আমি উপগ্রহের একটা ছবি দেখছিলাম।'
ক্রানা কাটুস্কার কাছাকাছি এসে জিজ্ঞেস করল, 'কীসের ছবি?'
'টাইফুনের। সমুদ্রের ওপর একটা টাইফুন তৈরি হচ্ছে!'
'ও! তাই নাকি।' ক্রানা ব্যাপারটাতে কোনো কৌতূহল দেখাল না। হাজার হাজার মাইল দূরে সমুদ্রে টাইফুন নিয়ে এখানে কেউ মাথা ঘামায় না। ক্রানা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'এখানে বসে থাকবে, নাকি বের হবে?'
কাটুস্কা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'চলো, বের হই।'
ক্রানা একটু অবাক হয়ে বলল, 'আচ্ছা কাটুস্কা, তোমার হয়েছেটা কী?'
কাটুস্কা জোর করে মুখে হাসি টেনে বলল, 'কী হবে? কিছু হয়নি।'

WWW.BDBANGLA.COM

'তোমার বয়সী একটা মেয়ের এ রকম গম্ভীর মুখে থাকার কথা না।'
কাটুস্কা গম্ভীর মুখে বলল, 'আমি মোটেও গম্ভীর মুখে থাকি না।'
কাটুস্কার কথা শুনে ক্রানা শব্দ করে হেসে উঠে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি গম্ভীর মুখে থাকো না! এখন চলো।'
'কোথায়?'
'সাইকাডোমে এডিফাসের কনসার্ট।'
'এডিফাসটি কে?'
ক্রানা চোখ কপালে তুলে বলল, 'তুমি এডিফাসের নাম শোনোনি? তার গান শুনে সব ছেলেমেয়ে পাগল হয়ে যাচ্ছে।'
'খুব ভালো গান গায়?'
'তা না হলে মানুষ তার জন্য এত পাগল হবে কেন?' গান থেকেও বড় ব্যাপার আছে।'
'সেটা কী?'
'পুরো সাইকাডোমে ইলেকট্রোম্যাডালেটিক রেজলেন্স তৈরি করে। আমাদের মস্তিষ্কের ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি মিলিয়ে দেয়, তখন নাকি অপূর্ব এক ধরনের অনুভূতি হয়।'
কাটুস্কা অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে বলল, 'সত্যি?'
'হ্যাঁ, দ্রীমান বলেছে আমাকে।'
কাটুস্কা একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, 'দ্রীমন সব সময়েই একটু বাড়িয়ে-চাড়িয়ে কথা বলে। তার সব কথা বিশ্বাস করো না।'
ক্রানা মাথা নাড়ল, বলল, 'আমি সেটা জানি।'

দুই বান্ধবী যখন সাইকাডোমে পৌঁছেছে তখন সেখানে কয়েক শ কম বয়সী ছেলেমেয়ে উপস্থিত হয়েছে। এই বয়সী ছেলেমেয়েরা নিয়ম ভাঙতে পছন্দ করে, তাই তাদের পোশাকে ছিরি ছাদ নেই। চোখে-মুখে-চুলে নানা ধরনের রঙ। কথাবার্তা, চলে-চলনে এক ধরনের অস্থিরতা।
সাইকাডোমের মাঝামাঝি একটা বড় স্টেজ, সেখানে কিছু মানুষ তাদের শরীরের সঙ্গে ইলেকট্রনিক সিনথেসাইজার লাগিয়ে উৎকট ভঙ্গিতে নাচানাচি করছে, তাদের অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম এক ধরনের সংগীতের সৃষ্টি হচ্ছে। কমবয়সী ছেলেমেয়েগুলোর অনেকেই তার সঙ্গে নাচার চেষ্টা করছে।
ক্রানা ও কাটুস্কার সঙ্গে তাদের ইনস্টিটিউটের আরও কিছু ছেলেমেয়ের দেখা হয়ে গেল। উত্তেজক এক ধরনের পানীয় খেতে খেতে তারা নাচানাচি করছে। দ্রীমনকে দেখা গেল এক পায়ে ভর দিয়ে অদৃশ্য কিছু একটা ধরার চেষ্টা করছে। ইনস্টিটিউটের সবচেয়ে সুদর্শন এবং সবচেয়ে একরোখা উদ্ধত ছেলে মাজুর সংগীতের তালে তালে নাচার চেষ্টা করছিল, কাটুস্কাকে দেখে হাত তুলে ডাকল, 'কাটুস্কা! এসো, এক পাক নাচি।'
কাটুস্কা মাথা নাড়ল, বলল, 'ইচ্ছে করছে না, মাজুর।'
মাজুর অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে বলল, 'সে কী! সাইকাডোমে এডিফাসের কনসার্ট শুনতে এসে তুমি নাচবে না, সেটি কি হতে পারে?'
কাটুস্কা উত্তরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন স্টেজ থেকে গম গম করে একজনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আমার প্রিয় ছেলে এবং মেয়েরা! তোমরা যার জন্য অপেক্ষা করছ, এই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা তরুণ-তরুণীর হৃদয়ের ধন এডিফাস তোমাদের সামনে এসে উপস্থিত হচ্ছে।'
তীব্র আলোর ঝলকানির সঙ্গে সঙ্গে সংগীতের তীব্র ধ্বনিতে পুরো সাইকাডোম কেঁপে কেঁপে ওঠে এবং সবাই দেখতে পায় গোল স্টেজের ঠিক মাঝখানে স্বল্পবসনা একটি নারীমূর্তি ওপর থেকে নেমে আসছে। সাইকাডোমের কয়েক শত ছেলেমেয়ে হাত তুলে চিৎকার করতে শুরু করে। স্বল্পবসনা এডিফাস তার হাতের শক্তিশালী লেজারের আলোতে সাইকাডোমের ছাদটি আলোকিত করে চিৎকার করে বলল, 'তোমরা কি তোমাদের মস্তিষ্কের ভেতর তীব্র আনন্দের অনুভূতির জন্ম দিতে প্রস্তুত?'
অসংখ্য ছেলেমেয়ে চিৎকার করে বলল, 'প্রস্তুত! প্রস্তুত!'
'তাহলে, চলো! আমরা শুরু করি–'
উদ্দাম সংগীতে পুরো সাইকাডোম প্রকম্পিত হয়ে ওঠে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সাইকাডোমের চারপাশে সাজিয়ে রাখা এন্টেনা থেকে মস্তিষ্কের ন্যাচরাল ফ্রিকোয়েন্সির কাছাকাছি তীব্র ইলেকট্রো ম্যাডালেটিক রেডিয়েশন আসতে শুরু করে।

কাটুস্কা অবাক হয়ে দেখল প্রথমে তার বুকের ভেতর গভীর এক ধরনের বিষণ্ণতা ভর করে। সেই বিষণ্ণতা কেটে হঠাৎ করে তার এক ধরনের ফুরফুরে হালকা আনন্দ হতে থাকে। হালকা আনন্দটুকু হঠাৎ তীব্র এক ধরনের উল্লাসে রূপ নেয়। তার মনে হতে থাকে, পৃথিবীর কোনো কিছুতেই আর কিছু আসে যায় না। মনে হতে থাকে তার জন্ম হয়েছে সৃষ্টি ছাড়া উদ্দাম বন্য আনন্দে মেতে ওঠার জন্য। সে চিৎকার করে মাথা দুলিয়ে সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে নাচতে শুরু করে। তার মনে হতে থাকে সাইকাডোমে কয়েক শ নেশাগ্রস্ত তরুণ-তরুণীর উদ্দাম নৃত্যের বাইরে আর কিছু নেই। কখনো ছিল না, কখনো থাকবে না।

গভীর রাতে কাটুস্কা যখন নিজের এপার্টমেন্টে ফিরে আসছিল, তখন মাজুর জড়িত কণ্ঠে বলল, কী মজা হলো তাই না, কাটুস্কা!'

কাটুস্কার মাথা তখনো ঝিমঝিম করছিল, সে অন্যমনস্কের মতো বলল, 'হ্যাঁ।'

বলল, 'মানুষ হয়ে বেঁচে থাকা কী আনন্দের ব্যাপার। আমাদের কী সৌভাগ্য, আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছিলাম।'

কাটুস্কা হঠাৎ একটু আনমনা হয়ে যায়। সত্যিই কি তা-ই? সত্যিই কি সাইকাডোমে মস্তিষ্কে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেজোলেন্স তৈরি করে উদ্দাম এক ধরনের সংগীতের সঙ্গে লাফালাফি করাই জীবন?

মাজুর পা টেনে টেনে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'পৃথিবীতে আনন্দের এত কিছু আছে, একটা জীবনে সব শেষ করতে পারব বলে মনে হয় না।'

কাটুস্কা তীক্ষ্ণ চোখে মাজুরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী কী আনন্দের জিনিস আছে পৃথিবীতে?'

'সব কি বলে শেষ করা যাবে?'

'তবুও বলো শুনি।'

'আমি শুনেছি, সবচেয়ে আনন্দের জিনিসটি হচ্ছে সমুদ্রের পানিতে শিকার করা।'

কাটুস্কা হাসার ভঙ্গি করে বলল, 'নির্বোধ মাছকে শিকার করার মধ্যে আনন্দ কোথায়?'

মাজুর চোখ মটকে বলল, 'মাছ শিকার করবে কে বলেছে?'

'তাহলে কী শিকার করবে?'

'মানুষ।'

কাটুস্কা অবাক হয়ে বলল, 'মানুষ? কোন মানুষ?'

'জলমানব। ডলফিনের পিঠে করে তারা প্রচণ্ড গতিতে ছুটে বেড়ায়। খুব ভালো হাতের টিপ না হলে ওদের মারা যায় না।'

'কী বলছ তুমি? জলমানব আবার কারা?'

পৃথিবীটা যখন পানির তলে ডুবে গেল, আমরা তখন এই পাহাড়গুলোতে বসতি করেছি। পৃথিবীতে পাঁচ বিলিয়ন মানুষ–তারা কোথায় যাবে? তারা সমুদ্রে গিয়েছে।'

'কিন্তু তারা তো সবাই সমুদ্রে ডুবে মারা গেছে।'

মাজুর মাথা নাড়ল, 'সবাই মারা যায়নি। কিছু কিছু মানুষ বেঁচে গেছে।'

'কীভাবে বেঁচে গেছে? সমুদ্রে তারা কোথায় থাকে? কী করে? কী খায়?'

'জানি না। তবে তারা আছে। জংলি আর হিংস্র। পানিতে তারা হাঙরের থেকে হিংস্র। দশ হাজার ইউনিট দিলে তাদের শিকার করতে যাওয়া যায়। এর চেয়ে উত্তেজনার আর কিছু নেই পৃথিবীতে। আমি ইউনিট জমাচ্ছি, আমি যাব জলমানব শিকার করতে।' মাজুর কাটুস্কার দিকে তাকাল, বলল, 'তুমি যেতে চাও?'

'দশ হাজার ইউনিট অনেক বেশি। আমার এত ইউনিট নেই। ছাড়া–'

মাজুর হা হা করে হাসল। বলল, 'আমাদের প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধানের মেয়ে বলছে, তার কাছে দশ হাজার ইউনিট নেই? তোমার এক পাটি জুতো নিশ্চয়ই দশ হাজার ইউনিট থেকে বেশি হবে! কাটুস্কা কোনো কথা বলল না।

ইনস্টিটিউটের ছোট ক্লাসঘরটিতে বসে কাটুস্কা সোনালি চুলের মধ্য বয়স্কা মহিলাটির কথা মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করে। মানবসভ্যতা নিয়ে গুরুগম্ভীর কিছু একটা বলছে, কাটুস্কা মন দিয়ে শুনেও ভালো করে বুঝতে পারে না।

'সভ্যতা একদিনে হয়নি।' মহিলাটি প্রায় যান্ত্রিক গলায় বলছে, 'লক্ষ বছরে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছে। এই পৃথিবীতে মানুষ প্রজাতির সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে তার সভ্যতা। এই সভ্যতাকে ধরে রাখার এবং বিকশিত করে রাখার দায়িত্ব আমাদের–'

কাটুস্কা হঠাৎ মহিলার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, 'আমাদের বলতে তুমি কাদের বোঝাচ্ছ? আমরা যারা এখানে আছি তারা, নাকি সমগ্র মানব জাতি?'

'অবশ্যই সমগ্র মানব জাতি?'
'তার মধ্যে কী জলমানবেরা আছে?'
সোনালি চুলের মহিলাটি থতমত খেয়ে বলল, 'তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছ, কাটুস্কা। আমরা নিশ্চয়ই একদিন সেটা নিয়ে আলোচনা করব।'
কাটুস্কা একটু অধৈর্য হয়ে বলল, 'এখন করতে দোষ কী? আমি শুধু জানতে চাইছি জলমানবেরা কি মানব জাতির অংশ?'
সোনালি চুলের মহিলাটির মুখ একটু কঠিন হয়ে যায়, বলে, 'না, তারা মানব জাতির অংশ নয়।'
'কেন নয়?'
মানুষ বলতে কী বোঝায় তার একটি আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা আছে। ক্রোমোজমে নির্দিষ্ট কোডিং দিয়ে সেটি করা আছে। সেই সংজ্ঞায় জলমানবেরা মানুষ নয়, তারা মানব সম্প্রদায়ের একটা অপভ্রংশ।'
'কিন্তু সেটা কি একটা কৃত্রিম বিভাজন নয়?'
'না, কৃত্রিম বিভাজন নয়। আমরা সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, জলমানবেরা নিচ্ছে না।'
কাটুস্কা কী বলবে বুঝতে পারল না, ইতস্তত করে বলল, হয়তো তারা সুযোগ পাচ্ছে না সে জন্য পারছে না।'
সোনালি চুলের মহিলাটি হেসে বলল, 'সেটা কি ভালো যুক্তি হলো? আমরা তো বলতে পারি, চিড়িয়াখানার একটা শিম্পাঞ্জিকে সুযোগ দেওয়া হলে তারাও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাজ করত! আমরা যদি তাদের জিনেটিক কোডিংয়ের উন্নতি করার চেষ্টা করতাম–'
ক্লাসের অনেকে শব্দ করে হেসে উঠল। কাটুস্কা কেন জানি রেগে ওঠে। সে মুখ শক্ত করে বলল, 'মানুষ আর শিম্পাঞ্জির মধ্যে পার্থক্য আছে।'
এক কোনায় বসে থাকা মাজুর গলা উঁচিয়ে বলল, সারা পৃথিবীর আর কয়টাই বা জলমানব আছে যে তাদের নিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করতে হবে? একটা করে টাইফুন আসে আর তারা ব্যাক্টেরিয়ার মতো মারা যায়। আমার মনে হয় কয়দিন পরে শিকার করার জন্যও জলমানব থাকবে না!'
কথাটা অনেকের কাছে কৌতুকের মতো মনে হলো–তারা সবাই শব্দ করে হেসে উঠল।
কাটুস্কা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে সোনালি চুলের শিক্ষিকা বলল, 'যে যা-ই বলুক, মানুষ হিসেবে পরিচিত হতে হলে তাকে একটা স্তরে পৌঁছাতে হয়। তাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতে হয়, সভ্যতার বিকাশে অংশ নিতে হয়। যদি সেটা না করে, তাদের মানুষ বলা যায় না–'
কাটুস্কা দুর্বল গলায় বলল, 'হয়তো তারা করছে। তাদের মতো করে করছে!'
মাজুর শব্দ করে হেসে উঠে বলল, 'কেমন করে করবে? তাদের কী কোয়ান্টাম কম্পিউটার আছে? তারা তথ্য রাখবে কোথায়? বিশ্লেষণ করবে কী দিয়ে? সিমুলেশন করবে কী দিয়ে? সিনথেসাইজ করবে কী দিয়ে?'
সোনালি চুলের মহিলা মাথা নেড়ে বলল, 'মাজুর ঠিকই বলেছে। এক হাজার বছর আগের জ্ঞান সাধনা আর এখনকার জ্ঞান সাধনার মধ্যে অনেক পার্থক্য! তখন সবকিছু করতে হতো মস্তিষ্ক দিয়ে। এখন কোয়ান্টাম কম্পিউটার মানুষের মস্তিষ্ক থেকে অনেক শক্তিশালী, এখন আমরা জ্ঞান সাধনা করি এই কোয়ান্টাম কম্পিউটার দিয়ে। আমাদের মস্তিষ্ক শুধু সেটা ব্যবহার করতে শেখে। মস্তিষ্কের মূল কাজ এখন উপভোগ। বিনোদন। সভ্যতার একটা বিশেষ পর্যায়ে আমরা পৌঁছেছি। মানুষ কখনো ভাবেনি আমরা এই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারব।...'
কাটুস্কা আস্তে আস্তে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। সোনালি চুলের মহিলাটি কী বলছে সে ভালো করে শুনতেও পায় না। সভ্যতা, জ্ঞান সাধনা, শিল্প-সাহিত্য–এই কথাগুলো মাঝেমধ্যে কানে ভেসে আসে কিন্তু সেই কথাগুলোর কোনো অর্থ আছে কি না কাটুস্কা যেন বুঝতে পারে না।
প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান রিওন মনিটার একটা ত্রিমাত্রিক নকশার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তখন খুট করে ঘরের দরজা খুলে তার একমাত্র মেয়ে কাটুস্কা উঁকি দিল। রিওন হাসিমুখে বললেন, 'কী ব্যাপার, কাটুস্কা?'
'বাবা, তুমি কী খুব ব্যস্ত?'
'হ্যাঁ মা, আমি খুব ব্যস্ত। কিন্তু আমি যত ব্যস্তই থাকি তোমার জন্য আমার সময় আছে। এসো।'
'আমি একেবারেই বেশি সময় নেব না–'
'তুমি যত খুশি সময় নিতে পারো। বলো, কী ব্যাপার।'
কাটুস্কা ইতস্তত করে বলল, 'আসলে আমি তোমাকে বিরক্ত করতে চাইছিলাম না, কিন্তু কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারছে না। যাকেই জিজ্ঞেস করি প্রশ্নটা এড়িয়ে যায়। প্রশ্নটা জলমানবদের নিয়ে–'

রিওনের মুখ হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে যায়। তিনি চেয়ারটা ঘুরিয়ে সোজাসুজি তার মেয়ের দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী প্রশ্ন?'

'জলমানবেরা কী আমাদের মতো মানুষ?'

রিওন সরু চোখে তার মেয়ের দিকে তাকালেন, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আজ থেকে পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বছর আগে একটা উল্কাপাতে পৃথিবীর সব ডাইনোসর মরে গিয়েছিল, তুমি জানো?'

'জানি।'

'ডাইনোসরদের জন্য তোমার কি দুঃখ হয়? তোমা কি মনে হয় পুরো পৃথিবীর তারা সবচেয়ে সফল প্রাণী, অথচ তারা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এটা ভুল?'

'সেটা তো একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছিল।'

'দুই শ বছর আগে যখন সারা পৃথিবী পানিতে ডুবে গিয়েছিল, সেটাও একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছিল। আমরা অল্প কিছু মানুষ উঁচু জায়গায় থাকি বলে বেঁচে গিয়েছি। যারা নিচু জায়গায় থাকে তারা সব পানিতে ডুবে গিয়েছিল। অল্প কিছু মানুষ নৌকায়, জাহাজে এটা-সেটা করে ভেসে ভেসে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছিল। আমরা সবাই জানতাম, কয়েক মাস কিংবা কয়েক বছরে তারা শেষ হয়ে যাবে।'

রিওন কথা বন্ধ করে আঙ্গুল দিয়ে টেবিলে ঠোকা দিতে দিতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। কাটুস্কা বললেন, 'কিন্তু তারা কয়েক মাস এবং কয়েক বছরে শেষ হয়ে গেল না?'

রিওন মাথা নাড়ল, বলল, 'হ্যাঁ, তারা সবাই শেষ হয়ে গেল না। কেউ কেউ দুই শ বছর পরও বেঁচে আছে। তাদের বেঁচে থাকাটা পৃথিবীর জন্য একটা সমস্যা–'

কাটুস্কা বলল, 'বাবা, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও নি। জলমানবেরা কী মানুষ?'

রিওন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'পৃথিবীটা পানিতে ডুবে যাওয়ার পর পৃথিবীর সম্পদ বলতে গেলে কিছু নেই। যেটুকু আছে সেটার ওপর আমরা নির্ভর করে আছি। জলমানবদের সঙ্গে সেটা ভাগাভাগি করলে কারও কিছু থাকবে না। তাই–'

'তাই কী বাবা?'

'তাই আমরা একদিন ঘোষণা দিলাম জলমানবেরা মানুষ নয়। কারণ হিসেবে ক্রোমোজমের কিছু জিনের উনিশ-বিশ দেখানো হলো–'

কাটুস্কা বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বের করে দিয়ে বলল, 'তার মানে আসলে জলমানবেরাও মানুষ। আমরা ইচ্ছে করে তাদের মানুষ বলি না।'

'তুমি ইচ্ছে করলে সেভাবে বলতে পার, কিন্তু তোমার যেন সেটা নিয়ে কোনো অপরাধবোধ না থাকে। পৃথিবীর প্রাণী টিকে আছে বিবর্তন দিয়ে। যারা শক্তিশালী, যারা বুদ্ধিমান, যারা দক্ষ। আমরা শক্তিশালী, আমরা বুদ্ধিমান, আমরা দক্ষ তাই আমরা টিকে গেছি।'

'তারাও টিকে আছে–'

'এই টিকে থাকার কোনো অর্থ নেই, কাটুস্কা। এটা মানুষের সম্মান নিয়ে টিকে থাকা নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কিছু নেই, শুধু পশুদের মতো সহজাত একটা প্রবৃত্তি নিয়ে টিকে থাকা। তার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই, কোনো তৃপ্তি নেই, কোনো স্বপ্ন নেই, কোনো ভবিষ্যৎ নেই। জলমানবের এই প্রজন্ম যাচ্ছে বিবর্তনের উল্টো দিকে। সভ্য থেকে অসভ্যের দিকে। এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম হচ্ছে আরও হিংস্র, আরও নিষ্ঠুর।'

কাটুস্কা কিছু না বলে চুপ করে রইল। রিওন মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'তোমাদের এই বয়সটা হচ্ছে আবেগের বয়স। এটা খুবই স্বাভাবিক যে তোমরা এটা নিয়ে ভাববে। কিন্তু সব সময় একটা কথা মনে রেখো–'

'কী কথা বাবা?'

'দুঃসময়ে টিকে থাকটাই বড় কথা। পৃথিবীর এখন খুব দুঃসময়, তাই আমাদের টিকে থাকতে হবে। জলমানব বা অন্যদের কথা ভাবলে আমরা টিকে থাকতে পারব না। বুঝেছ?'

'বুঝেছি।' কাটুস্কা মাথা নাড়ল।

'সে জন্যে যেন কারও অপরাধবোধের জন্ম না হয়। এটা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। যে যোগ্য সে টিকে থাববে। তাই আমরা যোগ্য হতে চাই। টিকে থাকতে চাই। বুঝেছ?'

'বুঝেছি, বাবা।' কাটুস্কা আবার মাথা নাড়ল। বলল, আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ, বাবা।'

৩.

নিহন ভাসমান দ্বীপের কিনারায় দাঁড়িয়ে বলল, 'ক্রিহা কোথায়?'
একজন বলল, 'আসছে। আমি খবর দিয়েছি।'
'তাহলে দেরি করে লাভ নেই। কায়ীরা বলেছে এক্ষুনি যেতে।'
আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়ে উজ্জ্বল চোখে বলল, 'কায়ীরা আমাদের নতুন দলপতি, কী মজা তাই না!'
নিহন মাথা নাড়ল, বলল, 'হ্যাঁ। দলপতি হওয়ার পর এটা হচ্ছে কায়ীরার প্রথম নির্দেশ। তাই সবাইকে খুব ভালো করে এটা করতে হবে।'
ভাসমান দ্বীপের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেমেয়েগুলো বলল, 'করব। অবশ্যই খুব ভালো করে করব।'
'টাইফুন আসছে। কায়ীরা বলছে, আমরা বোঝার আগেই নাকি চলে আসবে। যারা গভীর সমুদ্রে গেছে আমাদের তাদের কাছে খবর দিতে হবে।'
ছেলেমেয়েগুলো মাথা নাড়ল। বলল, 'ঠিক আছে, চলো তাহলে রওনা দিয়ে দিই।'
নিহন বলল, 'তোমরা তো নিয়ম জানো। দুজন করে একটা দল। নিজেরা দল ভাগ করে রওনা দিয়ে দাও। চারদিকে চারটি দল যাও। কে কোথায় গেছে তালিকাটা নিয়ে এসেছি, যাওয়ার আগে তোমরা দেখে নাও।'
ছেলেমেয়েগুলো তালিকাটা দেখে, কোন দলের কতগুলো নৌকাকে খবর পৌঁছাতে হবে মনে মনে ঠিক করে নেয়। লাল চুলের একটা মেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আর তুমি, নিহন তুমি কোন দিকে যাবে?'
'মাহার পরিবার পাওয়ার বোট নিয়ে বের হয়েছে। অনেক দূর চলে গেছে নিশ্চয়ই। আমি তার কাছে যাই।'
'ঠিক আছে।'
'ক্রিহা আসছে না, সেটাই হচ্ছে সমস্যা। দেরি করলে বিপদ হয়ে যাবে।'
'দেরি করবে না। ক্রিহা খুব দায়িত্ববান ছেলে।' নিহন বলল, 'তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা করো না। রওনা দিয়ে দাও।'
ছেলেমেয়েগুলো বলল, 'হ্যাঁ দিচ্ছি। তারা কোমরে ঝোলানো ছোট ব্যাগ থেকে সামুদ্রিক মাছ থেকে তৈরি করা এক ধরনের ক্রিম মাখতে থাকে। সমুদ্রের লোনা পানিতে দীর্ঘ সময় থাকতে হলে তারা এই ক্রিমটা শরীরে মেখে নেয়, তাহলে শরীরের চামড়া শুষ্ক বিবর্ণ হয়ে ওঠে না। তাদের গলায় ঝোলানো আলট্রাসাউন্ড হুইসেলগুলো নিয়ে সমুদ্রের পানিতে মুখ ডুবিয়ে বাজাতে শুরু করে। পোষা ডলফিনগুলো সাধারণত খুব দূরে যায় না, হুইসেলের শব্দ শুনে তারা ছুটে আসতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেগুলো ভুস করে পানি থেকে বের হয়ে আসে। ছেলেমেয়েগুলো ডলফিনগুলোর শরীরে হাত বুলিয়ে আদর করে, তাদের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলে। তারপর তাদের পিঠে উঠে দেখতে দেখতে সমুদ্রের পানি কেটে দূরে অদৃশ্য হয়ে যায়।
নিহন একা দাঁড়িয়ে থাকে। ক্রিহা এখনো আসেনি। দায়িত্ববান ছেলে, তার না আসার কথা নয়। সম্ভবত কোনো ঝামেলায় পড়েছে। টাইফুনের আগে দ্বীপটাকে রক্ষা করার জন্য এক শ ধরনের কাজ করতে হয়। ক্রিহাকে হয়তো সেরকম কোনো দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিহার বদলে আর কাউকে নিতে হবে। এখন সে কাকে খুঁজে পাবে। সবাই নিশ্চয়ই কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত। এক হয় একা চলে যাওয়া, সমুদ্রে একা যাওয়া নিষিদ্ধ, সব সময় সঙ্গে অন্য কাউকে থাকতে হয়। কত রকম বিপদ হতে পারে, সঙ্গে অন্য একজন থাকলে বিপদের ঝুঁকি অনেক কমে যায়। বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে এসে খবর দিতে পারে।
নিহন আকাশের দিকে তাকাল। ধূসর এক ধরনের মেঘ জমাতে শুরু করেছে, চারপাশে কেমন থমথমে একটা ভাব চলে এসেছে, তার আর দেরি করা ঠিক হবে না। নিহন ঠিক করল, সে একাই চলে যাবে। সমুদ্রকে তার এতটুকু ভয় করে না। একা একা সে সমুদ্রে বহুবার গেছে, সব নিয়ম যে সব সময় মানা যায় না, সেটা সবাই জানে।
নিহন তার গলায় ঝোলানো হুইসেলটা পানিতে ডুবিয়ে পরপর তিনবার একটা টানা শব্দ করল। এটা তার পোষা ডলফিনটা, শুশুর সংকেত। সংকেত পেলেই শুশু চুটে আসবে।
নিহন সমুদ্রের পানিতে পা ডুবিয়ে বসে থাকে, বহু দূরে একটা ডলফিনকে পানির ওপর ঝাঁপিয়ে উঠতে দেখে, নিশ্চয়ই শুশু! নিহনকে শুশু অসম্ভব ভালোবাসে। নিহন সমুদ্রের পানিতে তাকিয়ে থাকে, দেখতে পায় পানি কেটে শুশু ছুটে আসছে। কাছাকাছি এসে শুশু শূন্যে ঝাঁপিয়ে উঠে তার আনন্দটুকু প্রকাশ করল। তারপর নিহনের কাছে এসে মাথা বের করে দাঁড়াল।
'এসেছ শুশু!'
শুশু মাথা নাড়ল। নিহন জিজ্ঞেস করল, 'সমুদ্রের কী খবর?'
শুশু তার গলার ভেতর থেকে এক ধরনের শব্দ করে। শব্দগুলোর অর্থ, 'ভালো। খুব ভালো।'

নিহন মাথা নাড়ল, বলল, 'না, ভালো না। টাইফুন আসছে।'
শুশু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার ভাষায় জিজ্ঞেস করল, 'টাইফুন?'
'হ্যাঁ, টাইফুন। খুব খারাপ একটা টাইফুন আসছে শুশু।'
শুশুর মুখে দুশ্চিন্তার একটা ছাপ পড়ে। নিহন এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে ডলফিনটির দিকে তাকিয়ে থাকে। পৃথিবীর মানুষ যখন শুকনো মাটিতে থাকত তখন কখনো কল্পনা করেনি সমুদ্রের এই প্রাণীটি তাদের এত বড় সহায় হয়ে দাঁড়াবে। পৃথিবীর মানুষকে পানিতে ঠেলে দেওয়ার পরও তারা যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি তার একটা বড় কারণ হচ্ছে এই ডলফিন। বিবর্তনের ধারায় মানুষের পরে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে গেছে ডলফিন। পৃথিবীর মানুষ কখনো কি কল্পনা করেছিল একদিন মানুষ আর ডলফিন পরস্পর কথা বলতে পারবে? অর্থহীন আদেশ-নির্দেশ নয়, কাজ চালানোর মতো কথা। এই দুটি প্রাণী যে এত কাছাকাছি হবে সেটা কি কেউ জানত? কায়ীরা বলে, জলমানবেরা নাকি জ্ঞানে-বিজ্ঞানেও অসাধ্য সাধন করেছে–এটাই কি সেই অসাধ্য সাধন?'
'টাইফুন খারাপ।' শুশু বোঝালো এবং দুশ্চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, বলল, 'বেশি খারাপ।'
'হ্যাঁ।' নিহন মাথা নাড়ে। 'এখন আমাদের গভীর সমুদ্রে যেতে হবে।'
শুশু আনন্দে পানি থেকে অনেকটুকু বের হয়ে এসে নিহনের মুখ স্পর্শ করে নিজের ভাষায় অনেক কথা বলে ফেলল, নিহন সব কথা ধরতে পারল না। 'সমুদ্র আনন্দ খেলা' এ রকম বিচ্ছিন্ন কয়েকটা শব্দ শুধু ধরতে পারল। নিহন মাথা নাড়ল, বলল, 'না, শুশু না। আমি তোমার সঙ্গে খেলা করতে যাচ্ছি না। আনন্দ করতে যাচ্ছি না। কাজ করতে যাচ্ছি। কাজ।'
শুশুকে আবার একটু উদ্বিগ্ন দেখায়, 'কাজ?'
'হ্যাঁ, কাজ।'
'কী কাজ?'
'গভীর সমুদ্রে যারা গেছে তাদের খবর দিতে হবে।'
'খবর?'
'হ্যাঁ।'
'কী খবর?'
'টাইফুনের খবর। তাদের চলে আসতে বলব' শুশুকে আবার উদ্বিগ্ন দেখায়। সে তার নিজের ভাষায় বলে, 'টাইফুন খারাপ। বেশি খারাপ।'
'হ্যাঁ। টাইফুন খারাপ, বেশি খারাপ। এখন চলো যাই।'
শুশু আনন্দে আবার পানি থেকে বের হয়ে এসে একটা পানির ঝাপটায় নিহনকে ভিজিয়ে দিল। বলল, 'চলো, বন্ধু চলো।'

নিহন আলগোছে শুশুকে জড়িয়ে ধরে, শুশু সঙ্গে সঙ্গে তার শক্তিশালী শরীরটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সমুদ্রের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পানি কেটে শুশু ছুটে যেতে থাকে। নিহন কপাল থেকে টেনে গগলসটা চোখের ওপর নিয়ে আসে। পানির ঝাপটায় নিহন কিছু দেখতে পায় না। শুশু নিহনকে নিয়ে হঠাৎ পানির নিচে ঢুকে যেতে থাকে, এটা এক ধরনের দুষ্টুমি। পানির নিচে খানিকটা ঢুকে হঠাৎ করে শুশু সোজা ওপরের দিকে ছুটে আসে, নিহন শুশুকে ধরে রাখতে পারে না–ছিটকে পানিতে গিয়ে পড়ে। পুরো ব্যাপারটায় শুশু খুব আনন্দ পায়, ডলফিনের যে কৌতুক বোধ আছে সেটা নিহন কখনো জানত না। শুশুকে দেখে সে শিখেছে।
নিহন পানিতে গা ভাসিয়ে শুয়ে থাকে, নিচে থেকে শুশু এসে তাকে নিজের ওপর তুলে নিয়ে ছুটে যেতে থাকে। নিহন শুশুর শরীরে হাত বুলিয়ে নরম গলায় বলে, 'শুশু। দুষ্ট মেয়ে।'
উত্তরে শুশু কিছু একটা বলে পানির ঝাপটায় নিহন কথাটি শুনতে পায় না। নিহন শুশুর পিঠে চেপে বসেছে, দুটি পা দুদিকে দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরেছে, শুশুর শরীরের সঙ্গে নিহন তার দেহটা শক্ত করে চেপে রাখে। শুশু পানি কেটে ছুটে যাচ্ছে। কোথায় যেতে হবে সে জানে, পানির মধ্যে ইঞ্জিনের পোড়া তেলের গন্ধটুকু সে বহুদূর থেকে ধরতে পারে।
প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর নিহন বহুদূরে মাহার নৌকাটা দেখতে পেল। ইঞ্জিনটা বন্ধ করে বিশাল একটা জাল টেনে তুলছে। জালের মধ্যে সামুদ্রিক মাছ আটকে আছে, সেগুলো ছটফট করে ছুটে পালানোর চেষ্টা করছে। নিহনকে দেখতে পেয়ে মাহা তার জাল টেনে তোলানো থামিয়ে একটু অবাক হয়ে গলা উঁচিয়ে চিৎকার করে বলল, 'কী

ব্যাপার, নিহন?'

'বলছি, দাঁড়াও।' নিহন শুশুকে নিয়ে মাহার নৌকার কাছে গিয়ে থামল। মাহা আর তার স্ত্রী নীহা নিহনকে নৌকায় উঠতে সাহায্য করে। নিহন নৌকায় বসে গগলসটা চোখ থেকে খুলে কপালে লাগিয়ে বলল, 'তোমাদের জন্য দুটি খবর নিয়ে এসেছি। একটা ভালো, একটা খারাপ। কোনটা আগে শুনতে চাও?'

মাহার কম বয়সী স্ত্রী নীহা বলল, 'আমি কোনো খারাপ খবর শুনতে চাই না।'

'না শুনলে কেমন করে হবে। শুনতে হবে, খুব খারাপ একটা টাইফুন আসছে, তোমাদের এক্ষুনি ফিরে যেতে হবে।'

'সত্যি?' মাঝ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিকই বলেছ, দেখেছ আকাশটা কেমন হয়ে যাচ্ছে।' মাহার স্ত্রী নীহা বলল, 'খারাপটা তো শুনলাম। এখন ভালো খবরটা বলো শুনি।'

'আমাদের নতুন দলপতি হচ্ছে, কায়ীরা।'

মাহা এবং নীহার চোখ একসঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'সত্যি?'

'হ্যাঁ। রিসি বুড়ো একটু আগে কায়ীরাকে দায়িত্ব দিয়েছে। কায়ীরা আমাকে পাঠিয়েছে তোমাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিতে।'

'চলো যাই' মাহা উঠে দাঁড়িয়ে তার জাল গুটিয়ে নিতে শুরু করে। নিহন দুজনের সঙ্গে হাত লাগায়। শুশু নৌকাটা ঘিরে ঘুরছিল, এবার পানি থেকে লাফিয়ে বের হয়ে নিহনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। নিহন গলা উঁচিয়ে বলল, 'আসছি, শুশু। আসছি।' মাহাকে শুরু করিয়ে দিয়ে নিহন আবার শুশুর পিঠে চেপে বসল। তার শরীরে হাত বুলিয়ে নরম গলায় বলল, 'তোমার খুব পরিশ্রম হচ্ছে, তাই না শুশু।'

শুশু মাথা নাড়ে, বলে, 'না, পরিশ্রম না।'

'তাহলে?'

শুশু আনন্দের ভঙ্গি করে বলল, 'আনন্দ।' নিহন শুশুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'তুমি খুব লক্ষ্মীমেয়ে। তোমাকে আমি খুব ভালোবাসি।'

শুশু মাথা নাড়ল, বলল, 'ভালোবাসি। আমি ভালোবাসি।'

'চলো এখন। আর কেউ বাকি আছে কি না খুঁজে দেখি?'

'চলো।' নিহনকে পিঠে নিয়ে শুশু প্রথমে শূন্যে ঝাঁপিয়ে ওঠে, তারপর সমুদ্রের গভীরে ডুবে যায়। নিহন নিঃশ্বাস আটকে রাখে, সে জানে এগুলো হচ্ছে শুশুর দুষ্টুমি। কয়েক মুহূর্ত পর শুশু নিহনকে নিয়ে আবার ওপরে ভেসে ওঠে। তারপর পানি কেটে ছুটে যেতে শুরু করে।

বিকেলবেলা যখন নিহন ফিরে আসে, তখন সে তাদের ভাসমান দ্বীপটাকে চিনতে পারে না। মাঝামাঝি অংশটা এর মধ্যেই ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য অংশগুলো আলাদা করে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেগুলো ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। বড় বড় পাম্পগুলো গর্জন করে কাজ করছে। মোটা শেকল দিয়ে ভাসমান দ্বীপগুলোকে নোঙর করে রাখার ব্যবস্থা করছে। দ্বীপের দুই হাজার মানুষের সবাই কোনো না কোনো কাজ করছে। ছোট ছোট বাচ্চাদেও কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা বড় বড় বাক্সে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছে। একেবারে যারা শিশু তাদের এর মধ্যে আলাদা করে রাখা হয়েছে। কয়েকজন মা তাদের নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। ক্রিটিনা ছোট ছোট অক্সিজেন মাস্ক তাদের মুখে পরানোর চেষ্টা করছে এবং বাচ্চাগুলো সেটা নিয়ে প্রবল আপত্তি করে হাত-পা ছুড়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে।

নিহন কায়ীরাকে খুঁজে বের করে, সে ডুবিয়ে রাখা অংশটুকুতে বাতাসের চাপ পরীক্ষা করছিল। নিহন কাছে দাঁড়িয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে, যখন সে একটু সময় পেল নিহন জিজ্ঞেস করল, 'কায়ীরা, তুমি কি আমাকে নতুন কিছু করতে দেবে, নাকি আমি নিজে কিছু একটা বের করে নেব?'

'আমি দিচ্ছি নিহন। তুমি একটু অপেক্ষা করো।'

'ঠিক আছে।'

'যারা সমুদ্রে গিয়েছিল, সবাইকে কি খবর দেওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ, খবর দেওয়া হয়েছে। তারা ফিরে আসতে শুরু করেছে।'

কায়ীরা আকাশের দিকে তাকাল, বলল, 'মাঝ রাত থেকেই টাইফুনের ঝাপটা টের পেতে থাকব। শেষ রাতে বিপজ্জনক হয়ে যাবে। আমাদের হাতে সময় খুব কম।'

নিহন কোনো কথা বলল না। কায়ীরা অনেকটা আপন মনে বলল, 'তার আগেই আমাদের সব কাজ শেষ করতে হবে।'

মধ্য বয়স্ক একজন মানুষ একটা মোটা দড়ি টেনে আনতে আনতে বলল, 'তুমি চিন্তা করো না, কায়ীরা। তার আগেই আমাদের সব কাজ শেষ হয়ে যাবে।'
কায়ীরা খুঁটিনাটি কয়েকটা জিনিস দেখে উঠে দাঁড়িয়ে নিহনকে বলল, 'তোমার দশজন ঠিক আছে?'
'নয়জন। ক্রিহাকে পানির পাম্পের কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। কায়ীরা এক মুহূর্তের জন্য ভুরু কুঁচকে বলল, 'তার মানে তুমি একা গিয়েছিলে।'
'হ্যাঁ।'
কায়ীরা কয়েক মুহূর্ত নিহনের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'বেঁচে থাকতে হলে ঝুঁকি নিতে হয়। কিন্তু কতটুকু নেওয়া যায় সেটা কিন্তু তোমাকে চিন্তা-ভাবনা করে ঠিক করতে হবে।'
'আমি করি, কায়ীরা।'
'ঠিক আছে। আমরা আমাদের পুরো দ্বীপটাকে ভাগ ভাগ করে ডুবিয়ে দিচ্ছি। এর নিচে বাতাস আটকে রাখার চেম্বারগুলো আছে। আমরা সেখানে থাকব।'
নিহন মাথা নাড়ল, বলল, 'হ্যাঁ। থাকব।'
'এত মানুষের অক্সিজেন সাপ্লাই সোজা কথা নয়। ওপর থেকে পাম্প করে আনতে হবে। চেম্বারগুলো পুরোপুরি বায়ু নিরোধক কি না দেখতে হবে। তুমি তোমার নয়জন নিয়ে পরীক্ষা করো। চেম্বারগুলো পুরোনো, অনেক জায়গায় জং ধরে গেছে। ছোটখাটো ফুটো অনেক আছে, বিপজ্জনক বড় ফুটো থাকলে সেগুলো বন্ধ করার ব্যবস্থা করো।'
নিহল বলল, 'ঠিক আছে, কায়ীরা।'
'মনে রেখো, যখন সবাই চেম্বারে বসে থাকবে তখন কিছু একটা ঘটে গেলে কিন্তু কিছু করতে পারবে না। যা করার আগে থেকে করবে।'
'বুঝতে পেরেছি, কায়ীরা।'
'যাও, নিচে চলে যাও।'

নিহন তার দলের নয়জনকে তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল। পানির নিচে কাজ করার জন্য তারা নিজেদের অক্সিজেন মাস্কগুলো লাগিয়ে নেয়। বাতাসের দ্রবীভূত অক্সিজেনকে বের করে নেওয়ার এই যন্ত্রটি অত্যন্ত চমকপ্রদ। জলমানবেরা দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে এটাকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করেছে। নিচে অন্ধকার, দেখার জন্য তারা সবাই আলোর টিউব নিয়ে নেয়। কিছু ব্যাক্টেরিয়া থেকে আলো বের হয়, সেগুলো সংগ্রহ করে এই টিউব তৈরি করা হয়েছে। ব্যাক্টেরিয়াগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই দীর্ঘদিন আলো পাওয়া যায়–তীব্র আলো নয়, কিন্তু কাজ চলে যায়।
পানির নিচে ঢুকে ওরা আলাদা হয়ে যায়, বাতাস আটকে রাখা চেম্বারগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। জায়গায় জায়গায় পানির বুদবুদ বের হচ্ছে। একজন ভেতরে ঢুকে ছোট ছোট ফুটোগুলো বুজিয়ে দিতে শুরু করে। আঠালো এক ধরনের পেস্ট নিয়ে এসেছে, গর্তের ওপর লাগানো হলে বাতাসের চাপে গর্তের ভেতরটুকু সঙ্গে সঙ্গে বুজিয়ে দেয়।
চেম্বারগুলো বায়ু নিরোধক করে ওরা যখন ওপরে উঠে এসেছে তখন অনেক রাত। ওপরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, তার সঙ্গে দমকা হাওয়া বইছে। ভাসমান দ্বীপের বেশির ভাগই ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে সব মানুষ ছোট একটা জায়গায় ভিড় করে রয়েছে। অনেকেই নৌকার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে, বাতাসে নৌকাগুলো দুলছে, সবাই সমুদ্রের নিচে চলে যাওয়ার পর নৌকাগুলোও ডুবিয়ে দেওয়া হবে। আজ রাতের জন্য সবার খাবারের আয়োজন করা হয়েছে এক জায়গায়, আগে কম বয়সীদের খাইয়ে দিয়ে বড়রা দ্রুত খেয়ে নিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মানুষগুলো পানির নিচে যেতে শুরু করবে।
নিহন তার খাবারটুকু নিয়ে একটা নৌকার পাটাতনে বসে দ্রুত খেয়ে নেয়। প্লেটটা বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে সে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দিয়ে কায়ীরাকে খুঁজে বের করল। কায়ীরা ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিয়ে সবাইকে পানির নিচে পাঠাতে শুরু করেছে। টাইফুনটি তাদের ওপর দিয়ে চলে যেতে কত সময় নেবে কে জানে, এই পুরো সময়টুকু পানির নিচে থাকতে হবে। টাইফুন চলে যাওয়ার পর আবার সব কিছু পানির ওপর ভাসিয়ে এনে তাদের জীবন শুরু করতে হবে।
নিহনকে দেখে কায়ীরা বলল, 'চেম্বারগুলো ঠিক আছে?'
'হ্যাঁ, কায়ীরা। ফুটোগুলো বন্ধ করেছি। অক্সিজেনের সাপ্লাই ঠিক রাখলে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'
'চমৎকার। তুমি তাহলে আমাদের সঙ্গে হাত লাগাও, সবাইকে পানির নিচে পাঠাতে শুরু করো।'
'ঠিক আছে, কায়ীরা।'

প্রায় হাজার দুয়েক মানুষকে পানির নিচে চেম্বারগুলোতে নামিয়ে দিতে দিতে রাত আরও গভীর হয়ে যায়। খানিকক্ষণ আগে যেটা ছিল দমকা বাতাস এখন সেটা রীতিমতো ঝোড়োহাওয়া। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এখন প্রবল বৃষ্টিতে পাল্টে গেছে। বৃষ্টির ঠান্ডা পানিতে সবাই শীতে অল্প অল্প কাঁপছে। নৌকাগুলো পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু বহুভ্কোণ একটা ভাসমান পাঠাতন সমুদ্রের পানিতে দুলছে। সেখানে কায়ীরা কয়েকজনকে নিয়ে অপেক্ষা করছে। নিহন নিচের চেম্বারগুলো পরীক্ষা করে ওপরে উঠে এসেছে। কায়ীরা জানতে চাইল, নিচে কী রকম অবস্থা, নিহন?'

'আট-দশ ঘণ্টা থাকার জন্য ঠিক আছে, কিন্তু তার বেশি হলে সমস্যা!'

'তার বেশি হওয়ার কথা নয়!'

'কী করছে সবাই?'

'ছোটরা হাঙর হাঙর খেলছে। তাদের মনে হয় খুব আনন্দ হচ্ছে।'

'আর বড়রা?'

'তারা বসে বসে গল্প-গুজব করছে। কেউ কেউ তাশ খেলছে।'

'চমৎকার।'

'যারা ছোটও না বড়ও না তারা দেখে এসেছি গান গাইছে।'

কায়ীরা মুখের ওপর থেকে মুখের পানি মুছে ফেলে হেসে ফেলল, 'চমৎকার। চলো, আমরা গিয়ে গানের আসরে যোগ দিই।'

'হ্যাঁ, চলো। নিচে সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

'দাঁড়াও তার আগে রিসি বুড়োকে নিচে পাঠিয়ে দিই! সে কিছুতেই আগে যেতে রাজি হলো না!'

নিহন মাথা নাড়ল, বলল, 'হ্যাঁ, সবাই জানে টাইফুন এলেই রিসি বুড়োর অন্য রকম আনন্দ হয়।'

নিহন কায়ীরার পিছু পিছু এগিয়ে যায়। পাটাতনের মাঝামাঝি জায়গায় অতিকায় সামুদ্রিক কচ্ছপের খোলের মাঝখানে রিসি বুড়ো দুই হাত বুকের কাছে রেখে নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছে। বৃষ্টির পানিতে সে ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু তারা এতটুকু বিকার নেই। কায়ীরা উবু হয়ে কাছে বসে ডাকল, 'রিসি বুড়ো।'

রিসি বুড়ো চোখ খুলে তাকাল, বলল, 'কী হয়েছে, কায়ীরা?'

'টাইফুনটা প্রায় চলে এসেছে। এখন চলো নিচে যাই।'

'তোমরা যাও, কায়ীরা।'

কায়ীরা অবাক হয়ে বলল, 'আমরা যাব? আর তুমি?'

'আজকে তোমার হাতে সকল দায়িত্ব তুলে দেওয়ার পর নিজেকে খুব হালকা মনে হচ্ছে। আমার আর কোনো দায়িত্ব নেই।'

'হ্যাঁ, কিন্তু–'

'আমি সারা জীবন যেটা করতে চেয়েছিলাম আজকে সেটা করব, কায়ীরা।'

'কী করবে, রিসি বুড়ো?'

'আমার এই সামুদ্রিক কচ্ছপের খোলে শুয়ে শুয়ে টাইফুনকে খুব কাছ থেকে দেখব।'

কায়ীরা চমকে উঠে বলল, 'কী বলছ, তুমি?'

'হ্যাঁ, কায়ীরা, আমি ঠিকই বলছি। আমাকে তোমরা সমুদ্রের পানিতে ভাসিয়ে দাও। আমি সমুদ্রের পানিতে ভেসে ভেসে টাইফুনকে দেখতে চাই–'

'তুমি কী বলছ? একটু পরে যখন বড় বড় ঢেউ আসবে তুমি কোথায় তলিয়ে যাবে–'

'আমি জানি।' রিসি বুড়ো তার শীর্ণ মুখে হাসে, হাসতে হাসতে বলে, আমি সারা জীবন এ রকম একটি কথা চিন্তা করেছি। টাইফুনের বাতাস আর সমুদ্রের ঢেউ, আমি তার মধ্যে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছি! কী চমৎকার একটি জীবন!'

কায়ীরা নিঃশব্দে কিছুক্ষণ রিসি বুড়োর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি সত্যিই এটা চাও, রিসি বুড়ো?'

'হ্যাঁ, কায়ীরা। আমি সত্যিই এটা চাই। আমি সারা জীবন এ রকম একটা সময়ের জন্য অপেক্ষা করে ছিলাম।'

কায়ীরা কোনো কথা না বলে রিসি বুড়োর শীর্ণ হাতটি নিজের হাতে টেনে নেয়। রিসি বুড়ো ফিসফিস করে বলল, 'আমার কী ভাল লাগছে তুমি চিন্তা করতে পারবে না! তোমার মতো একজনের হাতে সবার দায়িত্ব দিয়ে কি নিশ্চিন্ত হয়ে বিদায় নিতে পারছি। একজন মানুষ তার জীবনে আর কী চাইতে পারে? রিসি বুড়ো শীর্ণ হাতে কায়ীরার মুখ স্পর্শ করে বলল, আমাকে বিদায় দাও, কায়ীরা।'

অতিকায় সামুদ্রিক কচ্ছপের খোলটি পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হলো। সমুদ্রে উত্তাল ঢেউয়ে দুলতে দুলতে সেটি ধীরে ধীরে ভেসে যেতে থাকে।
কায়ীরার পাশে নিহন চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়ায় তাদেরকে মনে হয় উড়িয়ে নেবে, তবুও তারা তারা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

৪.
প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান রিওন শুতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন তার আঠারো বছরের মেয়ে কাটুস্কার ঘরে এখনো আলো জ্বলছে। এত রাত পর্যন্ত জেগে জেগে কাটুস্কা কী করছে দেখার জন্য রিওন তার মেয়ের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিলেন। কাটুস্কা বিছানায় হাঁটু মুড়ে বসে মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে। রিওন একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এত রাতে তুমি কী করছ কাটুস্কা?'
'দেখছি।'
'কী দেখছ?'
'টাইফুন। উপগ্রহের ছবিতেই এটা ভয়ঙ্কর। সত্যি সত্যি যদি দেখা যেত তাহলে না জানি কত ভয়ঙ্কর দেখাত।'
রিওন হেসে বললেন,' তোমার কী হয়েছে কাটুস্কা, তুমি এত রাত জেগে মনিটরে উপগ্রহের তোলা টাইফুনের ছবি দেখছ কেন?'
'ইনস্টিটিউট থেকে আমাদের হোমওয়ার্ক দিয়েছে। কোয়ান্টাম কম্পিউটার ব্যবহার করে এর গতিপথটা বের করতে হবে। তারপর দেখতে হবে আমাদের হিসাবের সঙ্গে মিলে কি না।'
'কী দেখলে? মিলেছে?'
কাটুস্কা মাথা নাড়ল। বলল, 'হ্যাঁ বাবা, মোটামুটি মিলে গেছে। টাইফুনটা যেদিক দিয়ে যাওয়ার কথা সেদিক দিয়েই যাচ্ছে।'
'চমৎকার। এখন তাহলে ঘুমাও।'
'হ্যাঁ বাবা, ঘুমাব।'
রিওন চলে যাচ্ছিলেন, কাটুস্কা তাকে থামাল, বলল, 'বাবা।'
'কী কাটুস্কা?'
'উপগ্রহের ছবিতে দেখেছিলাম সমুদ্রের ওপর ছোট ছোট দ্বীপ। এগুলো কি জলমানবদের আস্তানা?'
'সম্ভবত।'
'ঠিক ওদের আস্তানার ওপর দিয়ে টাইফুনটা যাচ্ছে। জলমানবদের কী হবে, বাবা?
'কী আর হবে? শেষ হয়ে যাবে।'
'তারা সরে যায় না কেন?'
'কেমন করে সরে যাবে? টাইফুন আসার ভবিষ্যদ্বাণীটাও তো তারা করতে পারে না। ওদের কাছে তো কোনো যন্ত্রপাতি নেই।' রিওন মাথা নেড়ে বললেন, 'কাটুস্কা! তোমার হয়েছেটো কী? কদিন থেকে শুধু জলমানব, জলমানব।'
কাটুস্কা বলল, 'না বাবা, কৌতূহল।'
'উপগ্রহের ছবি কী বলে? আস্তানাটা আছে, না নেই?'
'নেই। একটু আগে ছোট ছোট কয়টা ভাসমান দ্বীপের মতো ছিল। এখন কিছু নেই।'
রিওন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'সব ভেসে গেছে।'
'এমন কি হতে পারে যে তারা কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে?'
রিওন শব্দ করে হেসে বললেন, 'নিরাপদ যাওয়াটা কোথায়? চারিদিকে শুধু পানি আর পানি।'
কাটুস্কা মাথা নাড়ল, বলল, 'তা ঠিক।'
রিওন চলে যাচ্ছিলেন, কাটুস্কা আবার তাকে থামাল, 'বাবা।'
'কী কাটুস্কা?'
'তুমি কয় দিন আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে আমি জন্মদিনে কী চাই। মনে আছে?'
'হ্যাঁ কাটুস্কা। মনে আছে। তুমি কী চাও?'
'দশ হাজার ইউনিট।'
স্পর্শ করে বলল, আমাকে বিদায় দাও, কায়ীরা।'

রিওন একটু অবাক হয়ে বললেন, 'এত ইউনিট দিয়ে কী করবে তুমি?'
'সমুদ্রে একটা অ্যাডভেঞ্চার পার্টি যায়, দশ হাজার ইউনিট তার ফি। খুব নাকি মজা হয়।'
'তুমি কোথা থেকে তার খোঁজ পেলে?'
'মাজুর বলেছে। মাজুরের কথা মনে আছে? আমাদের ইনস্টিটিউট পড়ে।'
'হ্যাঁ, মনে আছে।'
'দেবে তো দশ হাজার ইউনিট?
রিওন এক মুহূর্ত কী একটা ভেবে বললেন, 'দেব। অবশ্যই দেব, কাটুস্কা।'

ইনস্টিটিউটের ক্লাসঘরে জানালার পাশে কাটুস্কা তার নির্ধারিত সিটে বসে অন্যমনস্কভাবে বাইরে তাকিয়েছিল। সামনে বড় ডেস্কে তাদের মধ্যস্থ ইনস্ট্রাক্টর তার ছোট ব্যাগটি রেখে সেখান থেকে ইন্টারফেসের ছোট মডিউলটা বের করতে করতে বলল, 'তোমাদের অভিনন্দন। তোমরা সবাই টাইফুনের গতিপথটি সফলভাবে বের করতে পেরেছ। তোমাদের হিসাবের সঙ্গে প্রকৃত গতিপথের বিচ্যুতি মাত্র দশমিক শূন্য শূন্য তিন শতাংশ। তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন।'
ক্লাসঘরে বসে থাকা ছেলেমেয়েরা আনন্দের মতো এক ধরনের শব্দ করল। কাটুস্কা ভুরু কুচকে সবার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারা অভিনন্দন পাওয়ার মতো এমন কী কাজ করেছে সে এখনো বুঝতে পারেনি।
মধ্যবয়সী ইনস্ট্রাক্টর ডেস্কের সামনে কয়েকবার পায়চারি করে মুখে এক ধরনের গাম্ভীর্য নিয়ে এসে খানিকটা নাটকীয়ভাবে বলল, 'তোমরা কোয়ান্টাম কম্পিউটার ব্যবহার করার একটা পর্যায় শেষ করেছ। এখন তোমার তার পরের পর্যায়ে যাবে। এই পর্যায়ে যাওয়ার জন্য তোমরা নিশ্চয়ই অনেক দিন থেকে অপেক্ষা করছ, কারণ যারা এই পর্যায়ে পৌঁছায় তারা কোয়ান্টাম কম্পিউটার ব্যবহার করে সিনথেসিস করতে পারে। এই সুযোগটি গ্রহণ করতে হলে তোমাদের নিজস্ব জিনেটিক কোডিং ব্যবহার করতে হয় নিরাপত্তার কারণে। তোমাদের অভিনন্দন। অনেক অভিনন্দন।'
কাটুস্কর কী মনে হলো কে জানে, হঠাৎ হাত তুলে বলল, 'তুমি একটু পর পর আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছ কেন? আমরা কী করেছি?'
মধ্যবয়সী ইনস্ট্রাক্টর বলল, 'তোমরা কোয়ান্টাম কম্পিউটার ব্যবহারের একটা নতুন স্তরে পৌঁছেছ। টাইফুনের গতিবিধি নিখুঁতভাবে বের করার জন্য তোমাদের এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে।'
কাটুস্কা বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। একটা বাচ্চা ছেলেও কোয়ান্টাম কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারবে। এখানে-সেখানে দুই-চারটা সুইচে চাপ দেওয়া, দুই-চারটা তথ্য খুঁজে বের করা–এর মধ্যে কোন কাজটা অভিনন্দন পাওয়ার মতো?'
মধ্যবয়স্ক ইনস্ট্রাক্টর কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল, ইতস্তত করে বলল, 'কিন্তু তোমাদের মতো এই পর্যায়ে পৌঁছায় খুব কম।'
'তার কারণ আমাদের বাবাদের ক্ষমতা বেশি, তারা আমাদের এই ইনস্টিটিউটে ভর্তি করিয়েছেন। আমাদের কোনো কৃতিত্ব নেই। সব কৃতিত্ব আমাদের বাবাদের।'
ক্লসরুমের মাঝামাঝি বসে থাকা মাজুর হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল। কাটুস্কা চোখ পাকিয়ে বলল, 'কী হলো, তুমি হাসছ কেন? আমি কী হাসির কথা বলেছি?'
মাজুর মাথা নাড়ে, বলে, 'না, তুমি মোটেই হাসির কথা বলো নাই।'
'তাহলে কেন হাসছ?'
'হাসছি, কারণ খুব সহজ একটা জিনিস তুমি বুঝেছ এত দেরিতে।'
কাটুস্কা চোখ পাকিয়ে বলল, 'এটা তোমরা আগে থেকে জানো?'
'হ্যাঁ। জানি। তবে আমরা তোমার মতো নাবালিকা না, তাই এটা নিয়ে চেঁচামেচি করি না।'
কাটুস্কা রেগে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মধ্যবয়স্ক ইনস্ট্রাক্টর তাকে থামিয়ে দিল। হাত তুলে বলল, 'অনেক হয়েছে। আমরা যে কাজ করতে এসেছি সেই কাজ করি।'
কাটুস্কা একটা নিঃশ্বাস ফেলে তার টেবিলের মনিটরটি নিজের কাছে টেনে নেয়।

ক্লাসের শেষে ছোট করিডরে সবাই একত্র হয়েছে। মাজুর তার উত্তেজক পানীয়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'আচ্ছা কাটুস্কা,

তোমার হয়েছেটা কী? তুমি সব সময় এত রেগে থাকো কেন?'
দ্রীমন বলল, 'হ্যাঁ, কী হয়েছে তোমার?'
কাটুস্কা মাথা নাড়ল, বলল, 'আমার কিছু হয়নি।'
ক্রানা মাথা নেড়ে বলল, 'উহু, তোমার কিছু একটা হয়েছে, কিছু একটা তোমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে।' কাটুস্কা মাথা নেড়ে বলল, 'আমাকে নতুন কিছু যন্ত্রণা দিচ্ছে না।'
'তাহলে? পুরোনো কিছু যন্ত্রণা দিচ্ছে?'
কাটুস্কা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'না না, এটা ঠিক যন্ত্রণা নয়।'
'তবে–'
'তবে কী?'
'তোমরা জানো আমাদের বয়সী ছেলেমেয়েরা এত বেশি আত্মহত্যা করে কেন? শতকরা প্রায় বারো ভাগ?'
মাজুর গম্ভীর হয়ে বলল, 'আত্মহত্যা এক ধরনের রোগ'
কাটুস্কা বলল, 'তাহলে আমি অন্যভাবে প্রশ্ন করি, আমাদের মতো কম বয়সীদের মধ্যে এই রোগটি এত বেশি কেন?'
দ্রীমন বলল, 'এ তো সব সময়ই ছিল?'
'না। ছিল না। যখন পৃথিবীটা স্বাভাবিক ছিল তখন আমাদের মতো কম বয়সীরা এত বেশি আত্মহত্যা করত না।'
মাজুর তার উত্তেজক পানীয়ের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'তুমি কী বলতে চাইছ কাটুস্কা?'
কাটুস্কা গম্ভীর মুখে বলল, 'আমি বলতে চাইছি যে আমাদের জীবনে কোনো আনন্দ নেই। আমাদের জীবনের কোনো অর্থও নেই। আমরা ভান করি আমাদের জীবন খুব গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের অনেক আনন্দ–এসব বাজে কথা। আনন্দ পাওয়ার জন্য সাইকাডোমে আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন দিয়ে রেজোনেন্স করাতে হয়।'
মাজুর মুখ শক্ত করে বলল, 'তুমি কী বলছ এসব? আমাদের জীবনে আনন্দ নেই? আমাদের জীবনের কোনো অর্থ নেই?'
কাটুস্কা মাথা নাড়ল, বলল, 'না, নেই। আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তার জন্য আমরা কোয়ান্টাম কম্পিউটারের কাছে যাই। সে আমাদের সবকিছুর সমাধান করে দেয়।'
'তা-ই তো দেবার কথা।' দ্রীমন অধৈর্য হয়ে বলল, সে জন্যেই তো কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরি করা হয়েছে!'
কাটুস্কা জোর করে হাসার চেষ্টা করে বলল, 'কোয়ান্টাম কম্পিউটারের একটা বোতাম টিপে একটা তথ্য বের করে আমি তোমাদের মতো আনন্দে লাফাতে পারি না।'
মাজুর মুখ শক্ত করে বলল, 'তুমি তাহলে কী চাও।'
কাটুস্কা বলল, 'আমি জানি না।'
ক্রানা হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'কাটুস্কা, তোমার কীসের অভাব? তোমার বাবা প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান। তোমার চেহারা অপূর্ব। তোমার জিনেটিক কোডিং একেবারে সবার ওপরে। তোমার আইকিউ অসাধারণ। তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করছ। তোমার এত কিছু থাকার পরও একেবারে সাধারণ রাস্তার ছেলের মতো কথা বলছ কেন?'
কাটুস্কা বিষণ্ণ গলায় বলল, 'আমি জানি না।'
মাজুর একটু এগিয়ে এসে কাটুস্কার পিঠে থাবা দিয়ে বলল, 'কাটুস্কা, মন ভালো করো। এ রকম গোমরামুখে থেকো না। তোমার এখন কী প্রয়োজন জানো?'
'কী?'
মাজুর গলায় একটু নাটকীয় ভাব এনে বলল, 'তোমার জীবনে এখন প্রয়োজন খানিকটা উত্তেজনা।
তোমার জীবন একটু একঘেয়ে হয়ে গেছে।'
ক্রানা জিজ্ঞেস করল, 'সেই উত্তেজনাটুকু আসবে কীভাবে?'
মাজুর চোখ বড় বড় করে বলল, 'খুব সহজে। আমরা কাটুস্কাকে নিয়ে যাব জলমানব শিকারে।'
কাটুস্কা ভুরু কুঁচকে মাজুরের দিকে তাকিয়ে রইল। মাজুর বলল, 'মানুষের জীবনে এর চাইতে বড় উত্তেজনার কিছু নেই। যারা গিয়েছে তারা বলেছে এই অভিজ্ঞতার কোনো তুলনা নেই। একজন ভীতু মানুষ, দুর্বল মানুষ, আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ জলমানব শিকার করার পর সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে যায়। তার কোনো দুর্বলতা থাকে না। ভয়-ভীতি থাকে না। জীবনটা অন্য রকম হয়ে যায়।'

কাটুস্কা জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি?'
'হ্যাঁ, সত্যি।'
'কেন?'
'মনোবিজ্ঞানীরা বলতে পারবেন। জনমানবেরা মানুষের মতো কিন্তু মানুষ নয়, তাই তাদের হত্যা করায় উত্তেজনা আছে, অপরাধবোধ নেই–এ রকম একটা ব্যাখ্যা পড়েছিলাম।'
কাটুস্কা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'খুব বিচিত্র ব্যাখ্যা।'
'বিচিত্র হতে পারে, কিন্তু সত্যি।' মাজুর কাটুস্কার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি যেতে চাও?'
কাটুস্কা মাথা নাড়ল, বলল, 'দেখি চেষ্টা করে।'
'দশ হাজার ইউনিট লাগবে।'
'সেটা হয়তো সমস্যা নয়।'
মাজুর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'চমৎকার।'
দ্রীমন বলল, 'আমিও যাব।'
মাজুর খুশি হয়ে বলল, 'তাহলে তো আরও ভালো। ক্রানা, তুমি যাবে না?'
বলল, 'তোমরা সবাই যদি যাও তাহলে আমি একা পড়ে থাকব কেন?'
'চমৎকার।' আনন্দে মাজুর তার উত্তেজক পানীয়টুকু এক ঢোকে শেষ করে বলল, 'তাহলে আমি ব্যবস্থা করে ফেলছি! ঠিক আছে?'
সবাই মাথা নাড়ল। বলল, 'ঠিক আছে।'

মাজুর খুব কাজের ছেলে, এক সপ্তাহের ভেতর সে সব ব্যবস্থা শেষ করে ফেলল। নানা রকম নৌযানে করা যায়, তারা বেছে নিল সাধারণ একটা ইয়ট। সমুদ্রের নীল পানিতে ধবধবে সাদা একটা ইয়ট ভেসে যাচ্ছে বিষয়টা চিন্তা করেই সবার মন ভালো হয়ে যেতে শুরু করে। ইয়টে থাকা-খাওয়া-বিনোদন–সব কিছুর ব্যবস্থা রয়েছে, ক্রুরা অভিজ্ঞ, তারা পুরো শিকারের বিষয়টা যেন নিরাপদে শেষ করা যায় তার খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করে রাখল।
প্রথম দিনেই তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবহার করা শেখানো হলো। নতুন ধরনের অস্ত্র একটা ম্যাগাজিনে প্রায় ১০০ বুলেট থাকে। ট্রিগার টেনে ধরে রাখলে মুহূর্তে ম্যাগাজিন খালি হয়ে যায়। ইয়টের ডেকে দাঁড়িয়ে চলন্ত টার্গেটের মধ্যে গুলি করতে করতে কাটুস্কা বিচিত্র এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করে। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটায় হাত বুলিয়ে সে মাজুরকে বলল, 'অস্ত্র কী বিচিত্র একটা জিনিস দেখেছ?'
মাজুর দূরে ভাসমান একটা টার্গেটে এক পশলা গুলি ছুড়ে দিয়ে বলল, 'কেন? তোমার কাছে এটা বিচিত্র কেন মনে হচ্ছে?'
'এটা তৈরিই করা হয়েছে মানুষকে হত্যা করার জন্য। মানুষ হয়ে মানুষকে হত্যা করার জন্য অস্ত্র তৈরি করা যায়, বিষয়টা কেমন জানি অদ্ভুত মনে হয়।'
দ্রীমন, বলল, 'শুধু মানুষকে হত্যা করার জন্য অস্ত্র তৈরি হয়নি। অন্য অনেক জন্তু-জানোয়ার অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়। জলমানবকে হত্যা করা হয়।'
কাটুস্কা মাথা নাড়ল, আস্তে আস্তে বলল, 'অস্ত্র আসলেই খুব বিচিত্র একটা জিনিস। আমি কখনো ভাবিনি আমি কোনো জীবন্ত প্রাণীকে হত্যা করতে পারব। কিন্তু এটা হাতে নেওয়ার পরই আমার কেমন জানি হাত নিশপিশ করছে। কোনো একটা জীবন্ত প্রাণীকে গুলি করব, সেটা ছটফট করতে থাকবে সেই দৃশ্যটা দেখার জন্য ভেতরটা কেমন জানি আকুলি-বিকুলি করছে।'
ক্রানা একটু অবাক হয়ে কাটুস্কার দিকে তাকাল। বলল, 'ঠিকই বলেছ তুমি! অস্ত্র খুবই অবাক একটা জিনিস।'
মাজুর তার হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা দিয়ে অনির্দিষ্টভাবে এক ঝাঁক গুলি করে বলল, 'এক শ ভাগ সত্যি কথা, গুলি করতে কী ভালোই না লাগে। শব্দটা কী সুন্দর, হাতের নিচে যে ঝাঁকুনিটা দেয় সেটা অসাধরণ। মনে হয় একটা জীবন্ত প্রাণী, তাই না?'
দ্রীমন মাথা নাড়ল, বলল, 'ঠিকই বলেছ, অস্ত্র খুব চমৎকার একটা জিনিস। নার্ভকে শান্ত রাখার জন্য এর থেকে ভালো কিছু আর হতে পারে না।'
কাটুস্কা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ইয়টের একজন ক্রুকে ঠিক এ রকম সময়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসবে দেখে সে থেমে গেল। মানুষটির রোদেপোড়া চেহারা, কঠিন সুখ এবং নীল চোখ। মাথার সামনের দিকে চুল হালকা

হয়ে এসেছে। কাছাকাছি এসে বলল, 'তোমাদের অস্ত্র চালানো কেমন হচ্ছে?'
মাজুর বলল, 'খুব ভালো। মোটামুটি টার্গেট ফেলে দিতে পারছি।'
দ্রীমন বলল, 'যত কঠিন হবে ভেবেছিলাম। মোটেও তত কঠিন নয়।'
কঠিন চেহারার মানুষটি হা হা করে হেসে বলল, 'ইয়টের ডেক থেকে গুলি করছ, কঠিন মনে হবে কেন? যখন সাগর স্কুটারে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ে ছুটে যেতে যেতে গুলি করবে তখন বুঝবে কাজটা সহজ না কঠিন।'
কাটুস্কা জানতে চাইল, 'সেটা আমরা কখন করব?' 'এখনই। আমি সেজন্য এসেছি।'
মাজুর আনন্দের মতো একটা শব্দ করল, বলল, 'চমৎকার। চলো তাহলে, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।'
ক্রানা বলেল, 'আমরা জলমানবদের দেখা পাব কখন?'
'সেজন্যে একটু অপেক্ষা করতে হবে।' কঠিন চেহারার মানুষটি বলল, 'জলমানবদের কাছাকাছি নেবার আগে তোমাদের সাগর স্কুটারে চড়া শিখতে হবে! সেখান থেকে গুলি করা শিখতে হবে।'
'কত দিন লাগবে?'
কঠিন চেহারার মানুষটি একটু হাসল, হাসির কারণে তাকে হঠাৎ সহৃদয় মানুষের মতো দেখায়, সে হাসতে হাসতে বলল, জলমানব শিকার হচ্ছে এক ধরনের স্পোর্টস। এটি কোনো নিষ্ঠুরতা নয়, কোনো যুদ্ধ নয়। জলমানব হচ্ছে মানুষের অপভ্রংশ, তাই তাদের আছে মানুষের বুদ্ধি। তারা পানিতে ভেসে থাকতে ব্যবহার করে ডলফিন, পানিতে ডলফিন থেকে সাবলীল কোনো প্রাণী নেই। এই দুই প্রাণী মিলে তৈরি হয় একটা অসাধারণ সমন্বয়। তাদের গুলি করা সোজা কথা নয়। তোমাদের সেটা সময় নিয়ে শিখতে হবে। সেজন্যে তোমাদের পরিশ্রম করতে হবে।'
কাজেই পরের কয়েক দিন তারা সমুদ্রের পানিতে সাগর স্কুটার চালানো শিখল। হাইড্রোজেন সেলের শক্তিশালী ইঞ্জিন গর্জন করে উঠতে থাকে আর শুকনো এলাকায় চারজন তরুণ-তরুণী সাগর স্কুটারে করে প্রচণ্ড গতিতে পানি কেটে ছুটে যেতে থাকে। একবার সাগর স্কুটারের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি দখলে নিয়ে নেওয়ার পর তারা একহাতে হ্যান্ডেলটা ধরে রেখে অন্য হাতে গুলি করা শিখতে শুরু করল। কাজটি কঠিন এবং বিপজ্জনক বড় কোনো দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে তারা তৃতীয় দিনের মাথায় ব্যাপারটা মোটামুটি শিখে নিল। চতুর্থ দিন ইয়টের ক্রুরা তাদের একটা পরীক্ষা নিল। নানা ধরনের চলমান টার্গেটকে তাদের গুলি করতে হলো, পানিতে না ডুবে তারা যখন সফলভাবে টার্গেটে গুলি করতে পারল তখন ঘোষণা দিয়ে তাদের ট্রেনিং সমাপ্ত করে দেওয়া হলো।
সেই রাতে একটা বিশেষ ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। ইয়টের ডেকে জ্বলন্ত আগুনে একটা সামুদ্রিক মাছ ঝলসে খেতে খেতে সবাই কথা বলছে। উত্তেজক পানীয় খাবার কারণে সবার ভেতরই এক ধরনের ফুরফুরে আনন্দ। ইয়টের ক্রুদের পক্ষ থেকে একসময় একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কাটুস্কা ক্রানা, দ্রীমন এবং মাজুর আমি আমার এই ইয়টের পক্ষ থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তেজনাময় স্পোর্টসের জন্য তোমরা এখন প্রস্তুত। তোমাদের অভিনন্দন।'
মাজুর হাত উঁচিয়ে একটা আনন্দের মতো শব্দ করল, অন্যেরাও তাতে যোগ দিল। মানুষটি বলল, 'আমি খুব আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমরা জলমানবের একটা আস্তানার খোঁজ পেয়েছি। আমাদের ইয়ট সেদিকে রওনা দিচ্ছে। আমরা আশা করছি আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা তার কাছাকাছি পৌঁছে যাব। আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমরা পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তেজনাময় স্পোর্টসে অংশ নেবে। তোমাদের অভিনন্দন।'
কাটুস্কা তার উত্তেজক পানীয়ের গ্লাসটা উপরে তুলে আনন্দে একটা চিৎকার করল। অন্য সবাই সেই চিৎকারে যোগ দেয়।
গভীর রাতে ইয়টের ডেকে শুয়ে শুয়ে আকাশের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে কাটুস্কার মনে হয়, মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে সত্যি এক ধরনের আনন্দ আছে। কাটুস্কার মনে হয় তার কী সৌভাগ্য যে সে মানুষ হয়ে জন্মেছিল। তাই সে এই আনন্দ আর উত্তেজনা উপভোগ করতে পারছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎ তার মনে হলো তার জীবনের এই আনন্দ আর উত্তেজনা কী সত্যি? নাকি এক ধরনের কল্পনা?

৫.

কায়ীরা চিন্তিত মুখে বলল, 'দূর সমুদ্রে একটা সাদা ইয়ট দেখা গেছে।'
কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একজন জিজ্ঞেস করল, 'কে দেখেছে?'
'তাহা পরিবার মাছ ধরতে গিয়েছিল, তারা বলেছে।'
'কোন দিকে যাচ্ছে?'

'এখনো বোঝা যাচ্ছে না।'
নিহন কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল, জিজ্ঞেস করল, 'কায়ীরা, ইয়টে করে স্থলমানবেরা কেন এসেছে বলে মনে হয়?'
কায়ীরা একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, 'আনন্দ করতে এসেছে। স্ফূর্তি করতে এসেছে।'
'তারা কেমন করে স্ফূর্তি করে?'
'ইয়টের ডেকে বসে তারা খায়-দায় আনন্দ করে। নাচানাচি করে। মাঝেমধ্যে শিকার করে।'
'কী শিকার করে?'
'পাখি, মাছ, ডলফিন। একবার শুনেছিলাম–'
'কী শুনেছিলে?'
কায়ীরা ইতস্তত করে বলল, 'আমি ব্যাপারটায় কখনো পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারিনি। ভাসা ভাসা ভাবে শুনেছি–'
'কী শুনেছ?'
'তারা নাকি দুই-একজন মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল। আমাদের মতো মানুষ–'
নিহন চমকে উঠে বলল, 'আনন্দ করার জন্য তারা মানুষ মারে?'
'আনন্দ করার জন্য নাকি অন্য কোনো কারণ ছিল জানি না। যে কলোনির মানুষকে মেরেছে তাদের সঙ্গে আমার কখনো কথা হয়নি।'
মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ বলল, 'কায়ীরা।'
'বলো।'
'আমাদের কি একটু সতর্ক থাকা দরকার?'
'হ্যাঁ।'
'কীভাবে সতর্ক থাকবে?'
'ওদের কাছাকাছি হতে চাই না।'
'যদি কাছাকাছি চলে আসে?'
'আসার কথা নয়।' কায়ীরা মাথা নেড়ে বলল, 'কখনো আসে না। কিন্তু তার পরও যদি চলে আসে আমরা সরে যাব। নৌকায় ডলফিনে সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সরে যাব।'
মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, 'আমি কি সবাইকে একটু সতর্ক করে রাখব?'
'এখনই না। শুধু শুধু ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। আমরা একটু দেখি ইয়টটা কোন দিকে যায়।'
কায়ীরা নিহনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নিহন, তুমি ইয়টটাকে চোখে চোখে রাখতে পারবে?'
'পারব, কায়ীরা।'
'একেবারেই কাছে যাবে না। অনেক দূরে থাকবে।
মনে রেখো ওরা কিন্তু বাইনোকুলার দিয়ে দেখতে পাবে।'
নিহন মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ জানি।'
'তাহলে তুমি যাও। সঙ্গে কতজনকে নিতে চাও?'
'যত কম নেওয়া যায়। সবচেয়ে ভালো হয় একা গেলে, যদি নিতেই হয় তাহলে আর একজন।'
'আমি যাব নিহনের সঙ্গে–আমি।' কিশোরী গলায় সুর শুনে সবাই ঘুরে তাকাল, নাইনা নামের ছিপছিপে মেয়েটি সবাইকে ঠেলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।
কায়ীরা মুখের হাসি গোপন করে বলল, 'তুমি?'
'হ্যাঁ, কায়ীরা আমি।'
'তুমি এই কাজের জন্য খুব ছোট।'
'না কায়ীরা' নাইনা তার কুচকুচে কালো চুল ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ করে বলল, 'আমি ছোট না। আমি সমুদ্রের তল থেকে এনিমম তুলে এনেছি। আমার ডলফিন ফিটি আমাকে নিয়ে ১০০ কিলোমিটার চলে যেতে পারে, আমি হাঙর শিকার করেছি, নীল তিমির দুধ দুয়েছি–'
'ব্যস! ব্যস! অনেক হয়েছে' কায়ীরা হেসে নাইনাকে থামিয়ে দিল। বলল, 'আমাদের কিছু নিয়মকানুন আছে। ছোট কিংবা বড় বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ না–কার কতটুকু অভিজ্ঞতা সেটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ।'
'আমাকে যদি যেতে না দাও আমার অভিজ্ঞতা হবে কেমন করে?'
'ঠিক আছে, আমি অনুমতি দিচ্ছি।'

নাইনা আনন্দের একটা শব্দ করতে যাচ্ছিল, কায়ীরা হাত তুলে থামিয়ে দিল, বলল, 'তুমি যেহেতু যথেষ্ট বড় হওনি আমার অনুমতি যথেষ্ট নয়। তোমার বাবা-মায়ের অনুমতি ছাড়া তোমাকে পাঠানো যাবে না!'

নাইনা একটা হতাশার মতো শব্দ করে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা তার মায়ের দিকে তাকাল, চোখে-মুখে একটা করুণ ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল, 'মা–'

নাইনার মা বললেন, 'তুই এতটুকুন মেয়ে কোথায় একটু লেখাপড়া করবি, ঘরের কাজ শিখবি তা না দিনরাত দস্যিপনা। সমুদ্রের পানি ছাড়া আর কিছু বুঝিস না।'

নাইনা প্রতিবাদ করে বলল, 'কে বলেছে আর কিছু বুঝি না। আমি ত্রিঘাত সমীকরণ শেষ করেছি মা। আমি আমার ক্লাসে জীববিজ্ঞানে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছি। আমি নীল তিমির চর্বি থেকে জ্বালানি তেল তৈরি করতে পারি। সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে কাপড় বুনতে পারি।'

'ঠিক আছে, বাবা, ঠিক আছে।' নাইনার মা হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'তুই যেতে চাইলে যা। কিন্তু খুব সাবধান।'

নাইনা এবার আনন্দের মতো একটা শব্দ করল। নিহন নাইনার মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল, 'নাইনা! আমি তোমার কাজকর্মের মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারি না। যে কাজ থেকে সবাই সরে থাকতে চায় তুমি সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাও! কারণটা কী?'

নাইনা দাঁত বের করে হেসে বলল, 'আমার মাথাটা মনে হয় একটু খারাপ!'

নাইনার মা বলল, 'হ্যাঁ। আসলেই তা-ই।' তোর আসলেই মাথা খারাপ। তারপর নিহনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নিহন, তুমি আমার এই মাথাখারাপ মেয়েটাকে একুট দেখে রেখো।'

নিহন মাথা নেড়ে বলল, 'আমি দেখে রাখব। তুমি চিন্তা করো না।'

'তোমার ওপর বিশ্বাস করে আমি যেতে দিচ্ছি। আমি জানি, তুমি নাইনাকে দেখে রাখবে।'

খুব ভোরবেলা রওনা দিয়ে নিহন আর নাইনা দুপুরবেলার দিকে একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থামল। ডলফিন দুটো ক্ষুধার্থ তাদের ছেড়ে দিয়ে দুজনে পানিতে শুয়ে থাকে। জলমানব শিশুদের জন্ম হয় পানিতে, তারা হাঁটতে শেখার আগে পানিতে ভেসে থাকতে শেখে। তখন নিহন সমুদ্রের প্রায় উষ্ণ পানিতে নিশ্চল হয়ে শুয়ে থেকে নাইনাকে ডাকল, 'নাইনা।'

'বলো।'

'ক্লান্ত হয়ে গেছ?'

নাইনা ডলফিনের পিঠে বসে সমুদ্রের পানির ভেতর দিয়ে এত দূর এসে সত্যিই ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সে এটি স্বীকার করতে চাইল না। বলল, 'না নিহন। ক্লান্ত হইনি!'

নিহন হেসে বলল, 'খানিকক্ষণ হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নাও। তারপর কিছু একটা খাও।'

নাইনা পানি থেকে মাথা বের করে বলল, 'আচ্ছা নিহন, আমরা যে রকম পানিতে ভেসে থাকতে পারি স্থলমানবেরা নাকি সে রকম ভেসে থাকতে পারে না?'

'পারে। তবে সেটা তাদের শিখতে হয়। তারা সেটাকে বলে সাঁতার কাটা। তাদের হাত-পা নাড়তে হয়।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা যে রকম পানিতে শুয়ে ঘুমিয়ে যেতে পারি, তারা সে রকম পারে না?'

নিহন মাথা নাড়ল, বলল, 'না, তারা পারে না।'

'কেন পারে না?'

'আমি ঠিক জানি না। মনে হয় পানিতে থাকার জন্য আমাদের ফুসফুস আকারে বড় হয়ে গেছে, বেশি বাতাস বুকের ভেতর তাকে বলে ভেসে থাকা সোজা। তা ছাড়া সমুদ্রের পানিতে লবণ, সে জন্যে আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশি–'

নাইনা অবাক হয়ে বলল, 'স্থলমানবের পানিতে লবণ নেই?'

'না। তাদের পানি বৃষ্টির পানির মতো!'

'কী আশ্চর্য!' নাইনা এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, 'আমার মাঝেমধ্যে খুব স্থলমানবদের দেখার ইচ্ছা করে।'

নিহন শব্দ করে হেসে উঠে বলল, 'এর চেয়ে বলো আমার একটা হাঙরের মুখের ভেতর মাথাটা ঢোকাতে ইচ্ছে করে! সেই কাজটাই বরং সহজ আর নিরাপদ।'

'তোমার কী মনে হয় নিহন? আমরা কী ইয়টের ভেতর স্থলমানবদের দেখতে পাব।'

'উহু। আমরা অনেক দূরে থাকব। দেখার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ইয়টটা কোন দিকে যায় আমরা শুধু সেটা লক্ষ করতে এসেছি।'
'নাইনা একটু আদুরে গলায় বলল, 'আমরা কী একটু কাছে গিয়ে দেখতে পারি না?'
'না ,নাইনা।' নিহন গম্ভীর গলায় বলল, 'আমরা কিছুতেই কাছে যাব না। দূরে থাকব। অনেক দূরে।'
নাইনা কোনো কথা বলল না, নিঃশব্দে পানিতে দুই হাত-পা ছাড়িয়ে শুয়ে রইল, তার খানিকটা আশাভঙ্গ হয়েছে।
কিছুক্ষণের মধ্যেই ডলফিন দুটো ফিরে এল, সমুদ্রের তলদেশ থেকে তারা ভরপেট খেয়ে এসেছে। শুশু তার মুখ দিয়ে ঠেলে নিহনকে জাগিয়ে তোলে। শুয়ে থাকতে থাকতে কখন যে তার চোখে ঘুম নেমে এসেছে সে জানে না। শুশু কিছু একটা বলল, কথাটি কী নিহন ঠিক ধরতে পারল না, জিজ্ঞেস করল, 'কী বলছ শুশু?'
'সাদা বড়।'
'সাদা বড় কিছু দেখেছ?'
শুশু মাথা নাড়ল। বলল 'ঝিক ঝিক ঝিক'
'ও আচ্ছা!' নিহন বুঝতে পারে, ডলফিন দুটো ইয়টটা দেখে এসেছে। শুশুকে ধরে বলল, 'ইয়টটা দেখেছ?'
'হ্যাঁ।'
'কোন দিকে যাচ্ছে?'
শুশু এবং কিকি মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল ইয়টটা পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাচ্ছে। নিহন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাদের ভাসমান দ্বীপটি উত্তরে, ইয়ট সেদিকে যাচ্ছে না।
নাইনা বলল, 'চলো, ইয়টটা দেখে আসি।'
'চলো।' নিহন আবার নাইনাকে মনে করিয়ে দেয়, 'আমরা কিন্তু বেশি কাছে যাব না।'
'ঠিক আছে নিহন, ঠিক আছে।'
কিছুক্ষণের মধ্যেই ডলফিনের পিঠে চেপে নিহন আর নাইনা পানি কেটে ছুটে যেতে থাকে। বহু দূরে যখন ধবধবে সবদা ইয়টটা দেখে গেল তারা দুজন তখন থেমে গেল। নিহন বলল, 'আর কাছে যাওয়া প্রয়োজন নেই। এখান থেকে দেখি।'
নাইনা বলল, 'ঠিক আছে।'
ডলফিন দুটোকে ছেড়ে দিয়ে তারা চুপচাপ পানিতে শুয়ে থাকে। বহু দূরে ইয়টটাকে আবছা দেখা যাচ্ছে, পানিতে একটা চাপা গুম গুম শব্দ শোনা যায়। ডলফিন দুটো ছাড়া পেয়ে তাদের ঘিরে ছোটাছুটি করতে থাকে, ছোট বাচ্চাদের মতো সেগুলো মাঝেমধ্যে পানি থেকে ঝাঁপ দিয়ে উপরে উঠে যায়। ডলফিন খুব হাসিখুশি প্রাণী। মানুষের কাছাকাছি থাকলে তারা আরও বেশি হাসিখুশি থাকে।
নিহন আর নাইনা পানিতে শুয়ে নিঃশব্দে ইয়টটার দিকে তাকিয়ে থাকে। এখান থেকে মনে হচ্ছে সেটা খুব ধীরে ধীরে যাচ্ছে কিন্তু দুজনেই জানে এটা খুব দ্রুত পানি কেটে এগিয়ে যাচ্ছে।
নিহন হঠাৎ পানি থেকে মাথা বের করে আনে। নাইনা জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে নিহন?'
'ইয়টটার ইঞ্জিন বন্ধ করেছে।'
'কেন?'
'জানি না। এখানে থেমে যাচ্ছে।'
নাইনা চোখ বড় বড় করে তাকাল, 'সত্যি?'
'হ্যাঁ।' নিহন তীক্ষ্ণ চোখে ইয়টটার দিকে তাকিয়ে থাকে, অনেক দূরে বলে ভালো করে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তার মুখে হঠাৎ দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল, সেটা নাইনার দৃষ্টি এড়াল না। নাইনা জানতে চাইল, 'কী হয়েছে নিহন?'
'বহু দূর থেকে কয়েকটা ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'
'কিসের ইঞ্জিন?'
'বুঝতে পারছি না। স্থলমানবদের কত রকম যন্ত্রপাতি আছে–তার কোনো একটা হবে।'
'কেন এর শব্দ হচ্ছে?'
'এখনো বুঝতে পারছি না। ইয়টটা থেমে গেছে। এখানে নোঙর ফেলবে মনে হয়।'
হঠাৎ করে শুশু এবং কিকি ভুস করে তাদের কাছাকাছি ভেসে উঠল। দুটি ডলফিনই উত্তেজিত গলায় কিছু একটা বলতে থাকে, তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। নিহন জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে শুশু।'
'আসছে। আসছে।'

নিহন অবাক হয়ে বলল, 'কী আসছে?'

'এক দুই তিন চার।'

'চারজন?'

শুশু এবং কিকি মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। চারজন আসছে।'

নিহন এবারে ভালো করে তাকাল এবং দেখতে পেল বহুদূর থেকে চারটি কালো বিন্দুর মতো কিছু একটা সমুদ্রের পানিতে ফেনা তুলে ছুটে আসছে।

নাইনা জিজ্ঞেস করল, 'ওগুলো কী?'

'জানি না। মনে হয় কোনো ধরনের জলযান। সমুদ্রের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে।'

'কোথায় আসছে?'

নিহন মাথা নাড়ল, বলল, 'জানি না। আমার মনে হয় আমাদের সরে যাওয়া উচিত।'

নাইনা একটু অনুনয় করে বলল, 'একটু দেখি। আমি কখনো স্থলমানব দেখিনি।'

'তোমার ডলফিনের ওপর উঠে বসো। যদি পালাতে হয় যেন দেরি না হয়।'

নাইনা কিকির উপর উঠে বসে। কিকি পানির উপর একবার লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করল কিন্তু নাইনা তাকে শান্ত করে রাখল।

নাইনা এবং নিহন একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল এবং দেখতে দেখতে চারজন স্থলমানব চারটা সাগর স্কুটারে করে তাদের কাছাকাছি চলে এল। নাইনা ফিসফিস করে নিহনকে বলল, 'দেখেছ, দুজন ছেলে, দুজন মেয়ে!'

'হ্যাঁ।'

'ওদের হাতে কালো মতন ওটা কী?'

নিহন বলল, 'আমি জানি না।'

নাইনা বলল, 'দেখেছ ওরা কালো মতন জিনিসটা হাতে তুলে নিচ্ছে!'

নিহন বলল, 'ওরা আমাদের ঘিরে ফেলতে চেষ্টা করছে!'

'কেন? ওরা কেন আমাদের ঘিরে ফেলতে চাইছে?'

হঠাৎ করে নিহনের কাছে পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যায়, সে ভরাট মুখে নাইনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সর্বনাশ নাইনা! সর্বনাশ!'

'কী হয়েছে?'

'এই মানুষগুলো আমাদের মারতে আসছে।'

নাইনা চমকে উঠে বলল, 'কী বলছ তুমি?'

'হ্যাঁ।' নিহন লাফিয়ে শুশুর উপর উঠে বলল, 'পালাও!'

'নাইনা, পালাও।'

উত্তেজনায় শুশু নিহনকে নিয়ে পানি থেকে লাফিয়ে উঠে গেল এবং ঠিক তখন তারা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের কর্কশ গুলির শব্দ শুনতে পেল। শিষের মতো শব্দ করে গুলিগুলো তাদের কানের কাছ দিয়ে ছুটে যায়। নিহন আতঙ্কিত চোখে নাইনার দিকে তাকাল, কিকির পিঠে বসে সে ছুটে পালানোর চেষ্টা করছে। পানি থেকে ভেসে উঠে সে আবার ডুবে গেল, আবার ভেসে উঠে ডুবে, আবার ডুবে গেল।

স্থলমানব চারজন তাদের সাগর-স্কুটার নিয়ে ছুটে যাচ্ছে, চলন্ত স্কুটার থেকে গুলি করা সহজ নয়, এক হাতে হ্যান্ডেলটা ধরে রেখে অন্য হাতে গুলি করতে হয়। গুলিগুলো তাই বেশির ভাগই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নিহন শুশুকে ধরে ফিসফিস করে বলল, 'সোজা যাও শুশু।'

'ভয়। শুশু ভয়।'

'কোনো ভয় নেই। আমি আছি।'

'তুমি আছ?'

'হ্যাঁ'

নাইনার পিছু পিছু দুজন স্থলমানব চুটে যাচ্ছে, নিহন শুশুকে নিয়ে তাদের পিছু ছুটে যেতে থাকে। সাগর-স্কুটারের গতি খুব বেশি, ডলফিনকে নিয়ে সেটাকে ধরে ফেলা সম্ভব নয়। নিহন তবু চেষ্টা করল। স্কুটারের প্রপেলর থাকে–ধারালো প্রপেলর থাকে–ধারালো প্রপেলরে লাগলে সে কিংবা শুশু জখম হয়ে যাবে, তাই সতর্ক থাকতে হবে।

নিহন দেখল একজন স্থলমানব হাতের অস্ত্রটা ওপরে তুলেছে, গুলি করবে। নাইনাকে দেখা যাচ্ছে ভয়ার্ত মুখ। তার

ডলফিনটাও অনভিজ্ঞ, কী করবে বুঝতে পারছে না, হঠাৎ করে পানি থেকে লাফিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। স্থলমানবটা ট্রিগার টেনে ধরতেই কান ফাটানো শব্দে গুলি বের হতে থাকে– নিহন তখন শুশুকে নিয়ে স্কুটারের ওপর দিয়ে লাফিয়ে যায়, হ্যাচকা টান দিয়ে সে তার হাতের অস্ত্রটা টেনে নেওয়ার চেষ্টা করল। স্থলমানবটা এর জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। তাল হারিয়ে সে পানিতে পড়ে যায়, নিয়ন্ত্রণহীন স্কুটারটা সমুদ্রের পানিতে গর্জন করে দুবার ঘুরপাক খেয়ে নিশ্চল হয়ে যায়। স্থলমানবটি পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে, অন্য একজন তখন তার কাছে ছুটে আসতে থাকে।

নিহনের দিকে একজন স্থলমানব ছুটে আসছে–একটি মেয়ে, হাতের উদ্যত অস্ত্র তার দিকে তাক করে রেখেছে, চোখের দৃষ্টি কী ভয়ঙ্কর! নিহন সেই মেয়েটির দৃষ্টি দেখে হতবাক হয়ে যায়, এটি কী ক্রোধ, জিঘাংসা, নাকি ঘৃণা? সে কী করেছে? এই মেয়েটি কেন তাকে হত্যা করতে চায়?

কানের কাছ দিয়ে গুলি ছুটে যেতে শুরু করেছে, নিহন শুশুকে নিয়ে লাফ দিয়ে মেয়েটির ওপর দিয়ে পার হয়ে গেল। প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ সাগর-স্কুটারের ইঞ্জিনের কান ফাটানো গর্জন, পানির ঝাপটা তার মধ্যে হঠাৎ নিহন নাইনার আর্তচিৎকার শুনতে পায়। নাইনা কি গুলি খেয়েছে? সর্বনাশ!

'শুশু, নাইনার কাছে যাও।'

'যাই। শুশু যাই।'

পানির নিচে ডুব দিয়ে শুশু নিহনকে নাইনার কাছে নিয়ে যায়, কাছাকাছি যাওয়ার আগেই সে পানির মধ্যে রক্তের গন্ধ পেল। নাইনা বিস্ফারিত চোখে কিকির দিকে তাকিয়ে আছে। নাইনা নয়, কিকির শরীর গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। নিহন চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'নাইনা! কী হয়েছে?'

'কিকি! আমার কিকি!'

'ছেড়ে দাও কিকিকে। ছেড়ে দাও।'

নাইনা অবুঝের মতো বলল, 'না। আমি ছাড়ব না। আমার কিকি মরে যাচ্ছে।'

নিহন ধমক দিয়ে বলল, 'ছেড়ে দাও। না হলে বাঁচতে পারবে না।'

নিহন হাত বাড়িয়ে নাইনাকে কাছে টেনে আনে, সঙ্গে সঙ্গে কিকি পানিতে ডুবে যেতে থাকে। এখন তারা দুজন মানুষ এবং একটা ডলফিন। তাদের বিরুদ্ধে চারজন মানুষ, তাদের কাছে শক্তিশালী সাগর-স্কুটার, তাদের কাছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। এই স্থলমানবদের সঙ্গে তারা কেমন করে পারবে? কিন্তু সবার আগে নাইনাকে রক্ষা করতে হবে। নাইনার মা বিশ্বাস করে তার সঙ্গে নাইনাকে পাঠিয়েছে। যেভাবে হোক তার নাইনাকে রক্ষা করতে হবে।

নিহন নাইনাকে ধরে রেখে বলল, 'নাইনা তুমি শুশুকে নিয়ে পালাও।'

'আর তুমি?'

'আমি পরে আসছি।'

'কীভাবে আসবে?'

নিহন অধৈর্য হয়ে বলল, 'আমি তার ব্যবস্থা করব। তুমি এখন পালাও।'

নিহন শুশুর পিঠে থাবা দিয়ে বলল, 'যাও। শুশু যাও।'

শুশু মাথা ঘুরিয়ে বলল, 'তুমি?'

'আমি পরে যাব।'

'মানুষ খারাপ।'

'হ্যাঁ।' নিহন মাথা নাড়ল, মানুষগুলো খারাপ। দেরি করো না, পালাও।'

শুশু নাইনাকে নিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিহন একা পানিতে ভেসে আছে। যে মানুষটি পানিতে পড়ে গিয়েছিল সে আবার তার সাগর-স্কুটারে উঠে দাঁড়িয়েছে। অন্য সবাই এখন আবার এদিকে আসছে। নিহন বুকভরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে পানিতে ডুবে যায়। ডুবসাঁতার দিয়ে সে পানির নিচে দিয়ে যেতে থাকে, ওপর দিয়ে সাগর-স্কুটারগুলো যাচ্ছে। শক্তিশালী প্রপেলারে পানি ফেটে যাওয়ার সময় বাতাসের বুদবুদে ওপরটুকু ঢেকে যাচ্ছে। ইঞ্জিনের গর্জনে পানি কেঁপে কেঁপে উঠছে।

নিহন পানির নিচে অপেক্ষা করে ঠিক মাথার ওপর দিয়ে একটা সাগর-স্কুটার যাবার সময় সে লাফিয়ে নিচে থেকে সেটাকে ধরে ফেলে। স্কুটারটা সঙ্গে সঙ্গে কাত হয়ে যায়, নিহন টান দিয়ে নিজের শরীরটা ওপরে তুলে নেয়। স্কুটারের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা হতচকিত হয়ে নিহনের দিকে তাকিয়ে আছে, নিহন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে স্কুটারের নিয়ন্ত্রণটা নেওয়ার চেষ্টা করল। লাভ হলো না, স্কুটারটা কাত হয়ে পানিতে পড়ে গেল। নিহন মানুষটিকে নিয়ে

পানিতে পড়ে যায়–মানুষটির শরীরে লাইফ জ্যাকেট তাই ভেসে উঠছিল, কিন্তু নিহন তাকে টেনে পানির নিচে নিয়ে যায়!

মানুষটি পানির নিচে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না–চোখ-মুখে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক এসে ভর করেছে। নিহন দেখতে পায় তার নাক-মুখ দিয়ে কিছু বাতাসের বুদবুদ বের হয়ে আসছে। নিহন একবার নিঃশ্বাস নিয়ে যেরকম দীর্ঘ সময় পানির নিচে থাকতে পারে এই মানুষটি সেটা পারে না। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মানুষটি ছটফট করছে বাতাসের অভাবে, তার বুকটা মনে হয় ফেটে যাবে! নিহন এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে এই অসহায় মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকে–ইচ্ছে করলেই সে তাকে মেরে ফেলতে পারে। তাকে কি সে মেরে ফেলবে?

নিহন মানুষটিকে ছেড়ে দিল। ছেড়ে দিতেই মানুষটি প্রাণপণে উপরে উঠে গিয়ে বুকভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। গলা দিয়ে পানি ঢুকে যায় খক খক করে কাশতে থাকে। নিহন নিজেও ধীরে ধীরে ওপরে ভেসে আসে। অন্য স্থলমানবগুলো তাকে ঘিরে ফেলছে। সে তাকিয়ে থাকে, দেখে আরো বেশ কয়েকটি সাগর-স্কুটার আসছে। সেখানে আরো মানুষ, তাদের হাতে আরও অস্ত্র।

নিহন একধরনের ক্লান্তি অনুভব করে। হঠাৎ করে সে বুঝতে পারল সে এই স্থলমানবদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না। যেকোনো মুহূর্তে একঝাঁক গুলি এসে তাকে ঝাঁঝরা করে দেবে। তার সময় শেষ হয়ে এসেছে।

নিহন তবুও সাবধানে বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বের করে দেয়। নাইনাকে সে বাঁচিয়ে দিয়েছে। নাইনার মাকে সে যে কথা দিয়েছিল সে সেই কথা রেখেছে।

নিহন পানিতে ভেসে ভেসে একঝাঁক গুলির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

৬.

মাজুর বলল, 'আমি এটাকে নিজের হাতে হত্যা করতে চাই।'

মাজুর যাকে নিজের হাতে হত্যা করতে চাইছে সেই নিহনকে ইয়টের ডেকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। একজন মানুষকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখার মধ্যে একধরনের অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতা রয়েছে, যদিও এখানে কেউই সেই নিষ্ঠুরতাটুকু ধরতে পারছে না।

মাজুর তার হাতের অস্ত্রটি হাত বদল করে বলল, 'তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে হত্যা করতে দেবে। দেবে না?'

দ্রীমন জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কেন একে হত্যা করতে চাইছ?'

মাজুর একটু অধৈর্য হয়ে বলল, 'কেন চাইব না? আমরা কি জলমানব শিকার করতে আসিনি?'

'কিন্তু শিকার করার জন্য প্রাণীটাকে মুক্ত থাকতে হয়।' দ্রীমন গম্ভীর গলায় ব্যাখ্যা করল, বেঁধে রাখা প্রাণীকে শিকার করলে সেটা খুন করা হয়ে যায়।'

'মানুষকে হত্যা করলে সেটা খুন হয়।' মাজুর নিহনকে দেখিয়ে বলল, 'এটা তো মানুষ নয়।'

দ্রীমন বলল, 'আমার কাছে তো বেশ মানুষের মতোই মনে হচ্ছে।'

মাজুর রেগে গিয়ে বলল, 'মানুষের মতো দেখালেই একজন মানুষ হয়ে যায় না।'

'তাহলে কখন মানুষ হয়?'

'যখন ক্রোমোজমে নির্দিষ্ট জিনসগুলো পাওয়া যায় তখন তাকে বলে মানুষ।'

দ্রীমন জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি এই মানুষটির জিনসগুলো পরীক্ষা করে দেখেছ?'

'কী বলছ তুমি আবোল-তাবোল?' মাজুর রেগে গিয়ে নিজের অস্ত্রটি হাতে নিয়ে বলল, 'আমি তোমাদের কোনো কথা শুনব না। দশ হাজার ইউনিট খরচ করে আমি এসেছি জলমানব শিকার করতে! আমি অন্তত একটা জলমানব শিকার না করে যাব না।'

কাটুস্কা এতক্ষণ চুপচাপ দুজনের কথা শুনছিল; এবার সে কথা বলল, মাজুরকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে তো শিকার করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। সাগর স্কুটারে করে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে তুমি তো গিয়েছিলে শিকার করতে। যাওনি?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।'

'তাহলে তখন শিকার করলে না কেন?'

মাজুর থতমত খেয়ে বলল, 'মানে তখন–'

কাটুস্কা হাসি গোপন করার চেষ্টা না করে বলল, 'আরেকটু হলে এই জলমানবটা তোমাকে শিকার করে ফেলত, মনে আছে? তোমাকে সে টেনে পানির ভেতর নিয়ে যায়নি? যদি তোমাকে ছেড়ে না দিত তাহলে কি তুমি এতক্ষণে পেট ফুলে পানিতে মরে ভেসে থাকতে না?'

মাজুর মুখ শক্ত করে বলল, 'তুমি কী বলতে চাইছ, কাটুস্কা?'

'আমি বলতে চাইছি, এই জলমানবের কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকার কথা যে সে তোমাকে মারেনি। তোমাকে মেরে ফেলার তার যথেষ্ট কারণ ছিল।'

মাজুরের মুখে কুটিল একধরনের হাসি ফুটে ওঠে, সে হাসিটাকে তার মুখে আরো বিস্তৃত হতে দিয়ে বলল, 'এই জলমানব তার সুযোগ পেয়েছিল, সুযোগটা ব্যবহার করতে পারেনি। এখন আমি আমার সুযোগ পেয়েছি, আমি আমার সুযোগ ব্যবহার করব।'

কাটুস্কা মাথা নাড়ল, বলল, 'না।'

মাজুর অবাক হয়ে বলল, 'না?'

'হ্যাঁ, তুমি একে মারতে পারবে না।'

'কেন পারব না?'

কাটুস্কা বলল, 'কারণ আমি আমার জীবনে এর চাইতে সুন্দর কোনো মানুষ দেখিনি। তুমি তাকিয়ে দেখো, এর মুখমণ্ডল কী অপূর্ব! খাড়া নাক, বড় বড় কালো চোখ। উঁচু চিবুক। মাথা ভরা কুচকুচে কালো চুল–দেখো, সেটা ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে! এর শরীরটা দেখো–মনে হয় কেউ যেন গ্রানাইট পাথর কুঁদে তৈরি করেছে। শরীরে এক ফোঁটা মেদ নেই। দেখো, বুকটা কত চওড়া, শরীরে কী চমৎকার মাংসপেশি!। তাকিয়ে দেখো, এর শরীরের ভেতর কী পরিমাণ শক্তি লুকিয়ে আছে। দেখে মনে হয় না যেন সে একটা চিতাবাঘের মতো, যেকোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে? তুমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখো মাজুর, তার হারের আঙ্গুলগুলো দেখো, লম্বা সুচালো, যেন একজন শিল্পীর হাত। দেখো, তার পা কত দীর্ঘ! তার কোমরটা দেখো, কেমন সরু হয়ে এসেছে। এই জলমানবটা একচিলতে কাপড় পরে আছে–দেখে কি মনে হচ্ছে না যার দেহ এত অপূর্ব তার এই একচিলতে কাপড়ই যথেষ্ট!'

মাজুর হকচকিত হয়ে কাটুস্কার দিকে তাকিয়ে রইল। ইতস্তত করে বলল, 'তুমি কী বলতে চাইছ, কাটুস্কা?'

'আমি বলতে চাইছি, গ্রিক দেবতা থেকেও সুন্দর এই জলমানবের পাশে তোমাকে দেখাচ্ছে একটা কৌতুকের মতন! তুমি আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো মাজুর, ফোলা মুখ, ঢুলুঢুলু লাল চোখ! শুকনো দড়ির মতো লাল চুল। ঢিলেঢালা থলথলে শরীর। কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছ। তোমার মুখ রাগে-ঘৃণায় বিকৃত হয়ে আছে। অথচ এই জলমানবটির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখো, সেখানে শিশুর মতো এক ধরনের নিষ্পাপ সারল্য–'

মাজুর হিশহিশ করে বলল, 'তুমি কী বলতে চাইছ, কাটুস্কা?'

আমি বলছি তুমি এই জলমানবকে হত্যা করতে পারবে না। তোমার মতন একজন অসুন্দর মানুষকে আমি এই অপূর্ব মানুষটিকে হত্যা করতে দেব না।'

'তুমি তাই মনে কর?'

কাটুস্কা তার মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি।'

'তুমি দেখতে চাও আমি একে হত্যা করতে পারি কি না?'

তার প্রয়োজন নেই, মাজুর। তুমি জানো আমার বাবা নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান। আমি স্যাটেলাইট ফোনে বাবাকে একটু বলে দিলেই এখানে দুটো হেলিকপ্টার চলে আসবে। আমি তোমার প্রতি একটু বিরক্তি প্রকাশ করলেই তোমাকে হাতকড়া লাগিয়ে নিয়ে যাবে।'

মাজুরের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়, সে নিচু গলায় বলে, 'তুমি কী বলতে চাইছ?'

'আমি বলছি তোমার নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে আমাকে বিরক্ত না করা।'

'তু-তুমি আমাকে ভয় দেখাতে চাইছ?'

'এমনিতেই যদি আমার কথা শুনতে তাহলে আমার ভয় দেখানোর প্রয়োজন হতো না, মাজুর।'

কাটুস্কা নিহনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে যায়। সে চোখের পানি মুছে বলল, 'মাজুর, তুমি এখন সরে যাও।'

'কেন?'

'আমি এখন এই জলমানবটার সঙ্গে কথা বলব?'

'কী বলছ তুমি, কাটুস্কা! তুমি জানো এরা কত ভয়ঙ্কর? কত নিষ্ঠুর?'

'আমার কাছে মোটেও ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে না। মোটেও নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে না। বরং কী মনে হচ্ছে জানো?'

'কী?'

'তুমি এর চেয়ে এক শ গুণ বেশি নিষ্ঠুর। এক শ গুণ বেশি ভয়ঙ্কর।'

মাজুর হকচকিতের মতো কাটুস্কার দিকে তাকিয়ে রইল।

পায়ের শব্দ শুনে নিহন মাথা ঘুরিয়ে তাকাল–ঠিক তার বয়সী একটা মেয়ে কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। একটু আগে এই মেয়েটিও অন্যদের নিয়ে তাকে আর নাইনাকে গুলি করে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল। কী ভয়ঙ্কর ছিল তার দৃষ্টি, চোখেমুখে কী আশ্চর্য রকম নিষ্ঠুরতা খেলা করছিল! এখন মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে একেবারেই কোমল স্বভাবের মেয়ে। চোখের দৃষ্টি নরম, ঠোঁটের কোনায় একধরনের হাসি। একটা মানুষ কেমন করে এক সময় এত ভয়ঙ্কর হতে পারে, আবার অন্য সময় এত কোমল চেহারার হতে পারে নিহন বুঝতে পারল না।

মেয়েটি কিছু একটা বলল, নিহন তার কথা ঠিক বুঝতে পারল না। ভাষাটি তাদের ভাষার মতোই তবে কথা বলার সুরটি অন্য রকম। নিহন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকাতেই মেয়েটি আবার কথা বলল। এবার নিহন কথাটি বুঝতে পারে; মেয়েটি বলছে, 'তোমার নাম কী?'

নিহন নামটি বলতে গিয়ে থেমে যায়, কেন এই মেয়েটিকে তার নাম বলতে হবে? একটা পশুকে মানুষ যেভাবে বেঁধে রাখে ঠিক সেভাবে শিকল দিয়ে তাকে বেঁধে রেখেছে, অথচ তার সঙ্গে মেয়েটা কথা বলছে খুব স্বাভাবিক একটা ভঙ্গিতে।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ?'

'হ্যাঁ।' নিহন মাথা নাড়ল, বলল, 'বুঝতে পারছি।'

মেয়েটি এবার হেসে ফেলে বলে, 'তুমি কী বিচিত্রভাবে কথা বল!'

নিহন কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েটি বলল, 'আমার নাম কাটুস্কা।'

নিহন এবারও কোনো কথা বলল না। মেয়েটি বলল, 'একজন যখন তার নাম বলে তখন অন্যজনকেও তার নাম বলতে হয়।'

নিহন বলল, 'একজন যখন গুলি করে তখন কি অন্যজনকেও গুলি করতে হয়?'

নিহনের কথাটা বুঝতে কাটুস্কা নামের মেয়েটির একটু সময় লাগল; যখন বুঝতে পারল তখন হঠাৎ করে তার মুখটি একটু বিবর্ণ হয়ে যায়। কাটুস্কা এক পা এগিয়ে এসে বলল, 'আমি খুব দুঃখিত। আমি-আমি-আমি ভেবেছিলাম–'

'কী ভেবেছিলে?'

'আমি ভেবেছিলাম তোমরা অন্য রকম।'

'সে জন্য তোমরা আমাদের গুলি করে মারতে চাইছিলে?'

কাটুস্কা নিঃশব্দে নিহনের দিকে তাকিয়ে রইল। নিহন বলল, 'তোমরা দেরি করছ কেন? কখন মারবে আমাকে?'

'আসলে–?'

'আসলে কী?'

'এই পুরো ব্যাপারটা আসলে একটা খুব বড় ভুল।'

নিহন মাথা নাড়ল, বলল, 'না। এটা ভুল না। আমি জানি আমাদের গুলি করে মারা তোমাদের জন্য একধরনের খেলা। তোমরা সেই খেলা খেলতে এসেছ।'

কাটুস্কা কোনো কথা বলল না। তার মুখটি আবার বিবর্ণ হয়ে যায়। নিহন বলল, 'তোমরা খেলা শেষ করবে না?'

কাটুস্কা মাথা নাড়ল, বলল, 'না। আমরা খেলা শেষ করব না।'

নিহন একটু অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল। বলল, 'তোমরা খেলা শেষ করবে না?'

কাটুস্কা মাথা নাড়ল। বলল, 'না।'

'কেন না?'

'অনেকগুলো কারণ আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে–' কাটুস্কা হঠাৎ থেমে যায়।

নিহন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কাটুস্কার দিকে তাকাল। কাটুস্কা একটু হেসে বলল, 'কারণটা হচ্ছে আমি আমার জীবনে তোমার মতো সুন্দর কোনো মানুষ দেখি নাই! এত সুন্দর একজন মানুষকে কিছু করা যায় না।'

নিহন এ ধরনের একটা কথার জন্য প্রস্তুত ছিল না, সে থতমত খেয়ে বলল, 'আমি সুন্দর মানুষ না। আমাদের দ্বীপে আমার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর মানুষ আছে।'

'থাকতে পারে। কিন্তু আমি তোমার মতো সুন্দর মানুষ দেখি নাই।'

নিহন কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, 'তুমিও অনেক সুন্দর।'

কাটুস্কা খিলখিল করে হেসে বলল, 'আমার সঙ্গে তোমার ভদ্রতা করতে হবে না। আমি কী রকম আমি জানি।'

নিহন কী বলবে বুঝতে না পেরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। কাটুস্কা বলল, 'আজকে আমরা যেটা করেছি সেটা খুব বড় একটা নির্বুদ্ধিতা ছিল।'
'এখন তাহলে কী করবে?'
'তোমাকে চলে যেতে দেব।'
নিহন অবাক হয়ে বলল, 'সত্যি?'
'হ্যাঁ, সত্যি।'
নিহন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না।'
'তুমি বিশ্বাস কর না?'
'না।'
'কেন বিশ্বাস কর না?'
'আমরা পানিতে থাকি। সমুদ্রের পানিতে কিছু ভয়ঙ্কর প্রাণী থাকে, নৃশংস আর হিংস্র। কিন্তু আমরা জানি স্থলমানবেরা তার চেয়েও বেশি নৃশংস আর হিংস্র।'
কাটুস্কা অবাক হয়ে নিহনের দিকে তাকিয়ে রইল। নিহন বলল, 'আমরা জানি কোনো টাইফুন আমাদের নিশ্চিহ্ন করবে না। যদি আমাদের কখনো কেউ নিশ্চিহ্ন করে দেয়, সেটা হবে তোমরা। স্থলমানবেরা।'
কাটুস্কার মুখে হঠাৎ বেদনার একটা ছায়া পড়ল। সে তার ঠোঁট কামড়ে ধরে রেখে বলল, 'এটা সত্যি নয়। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে তোমার নিজের এলাকায় যেতে দেব! দেবই দেব।'
কাটুস্কা একটু সরে গিয়ে তার যোগাযোগ মডিউলটা বের করে তার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করল, ছোট স্ক্রিনে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা।'
'কী হলো, কাটুস্কা! তোমাদের সমুদ্রের অ্যাডভেঞ্চার কেমন হচ্ছে?'
'আমি যে রকম ভেবেছিলাম সে রকম না।'
'কেন, কাটুস্কা?'
একটা নিঃশ্বাস ফেলে কাটুস্কা বলল, 'আমি ভেবেছিলাম জলমানবেরা হবে মানুষের অপভ্রংশ। তারা দেখতে হবে ভয়ঙ্কর। বীভৎস। হিংস্র।'
'তারা তাহলে কী রকম?'
'তারা অপূর্ব সুন্দর, বাবা। তারা গ্রিক দেবতা থেকেও সুন্দর।'
কাটুস্কার বাবা প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান রিওন কোনো কথা না বলে শিস দেওয়ার মতো একটা শব্দ করলেন। কাটুস্কা বলল, 'জলমানবকে শিকার করা সম্ভব না।'
'ঠিক আছে। তাহলে চলে এসো।'
'একটা ব্যাপার ঘটেছে, বাবা।'
'কী ঘটেছে!'
'আমরা সবাই মিলে একটা জলমানব ধরেছি।'
'কী বললে?' রিওন অবিশ্বাসের গলায় বলল, 'ধরেছ? জ্যান্ত ধরেছ?'
'হ্যাঁ, বাবা। আমি তাকে ছেড়ে দিতে চাই।'
'ছেড়ে দিতে চাও?'
'হ্যাঁ, বাবা। তুমি যেভাবে হোক তার ব্যবস্থা করে দাও।'
রিওন এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন, বললেন, 'তুমি কেন তাকে ছেড়ে দিতে চাও?'
'কারণ আমি তাকে কথা দিয়েছি। সে আমার কথা বিশ্বাস করে নাই। আমি তাকে দেখাতে চাই আমরা সত্যি কথা বলি।'
'ও আচ্ছা!' রিওন আস্তে আস্তে বললেন, 'তুমি জলমানবের সঙ্গে কথাও বলেছ?'
'হ্যাঁ, বাবা। জলমানবটির মুখ শান্ত। খুব চমৎকার।'
রিওন আবার বললেন, 'ও আচ্ছা।'
'তুমি তাকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করো।'
'ঠিক আছে। আমি একটা হেলিকপ্টার পাঠাচ্ছি। হেলিকপ্টারে করে তার এলাকায় নামিয়ে আসবে।'
'সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'
'বাবা, তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব–'
'পাগলি মেয়ে, বাবাকে ধন্যবাদ দেওয়ার কী আছে।'
'বিদায়, বাবা!'
'বিদায়! সমুদ্রভ্রমণ উপভোগ করো।'

কাটুস্কা তার যোগাযোগ মডিউলটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে নিহনের দিকে এগিয়ে বলল, 'আমি সব ব্যবস্থা করে এসেছি।'
'কী ব্যবস্থা?'
'তোমাকে তোমার এলাকায় নামিয়ে দিয়ে আসবে।'
নিহন কিছুক্ষণ অবাক হয়ে কাটুস্কার দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন করে?'
'হেলিকপ্টারে করে?'
'হেলিকপ্টারে?'
'হ্যাঁ।'
'তুমি কেমন করে হেলিকপ্টার আনবে।'
'আমার বাবা প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান। আমার বাবার অনেক ক্ষমতা।'
'ও।'
'তুমি এখন আমার কথা বিশ্বাস করেছ?'
নিহন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল; তারপর বলল, 'হ্যাঁ, বিশ্বাস করেছি।'
'চমৎকার!' কাটুস্কা একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, 'তোমাকে এভাবে ধরে এনে আমার খুব খারাপ লাগছিল। তোমাকে তোমার এলাকায় ছেড়ে দিয়ে আসব ভেবে আমার এখন একটু ভালো লাগছে।'
নিহন নিজেও এবার একটু হাসার চেষ্টা করল। কাটুস্কা বলল, 'তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি তোমার শিকলটা খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করি।'
কাটুস্কা চলে যেতে যেতে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি খিদে পেয়েছে? তুমি কি কিছু খেতে চাও? কোনো পানীয়?'
'না, কাটুস্কা। ধন্যবাদ।'
কাটুস্কা চলে যাচ্ছিল; নিহন তাকে ডাকল, 'কাটুস্কা।'
'বলো।'
'তুমি আমার নাম জিজ্ঞেস করেছিলে। আমার নাম নিহন।'
কাটুস্কা তার হাতটি নিহনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নিহন, তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম।'
নিহন কাটুস্কার হাতটা স্পর্শ করে বলল, 'আমিও খুব খুশি হলাম, কাটুস্কা।'

হেলিকপ্টারটি বেশ বড়, ইয়টের ডেকে সেটি নামতে পারল না। ইয়টের ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নাইলন কর্ডের একটা মই নামিয়ে দিল। নিহন মই বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে মাঝখানে থেমে নিচে তাকাল, ইয়টের ডেকে বেশ কয়জন দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে কাটুস্কাও আছে। নিহনকে তাকাতে দেখে কাটুস্কা হাত নাড়ল। নিহনও প্রত্যুত্তরে হাত নাড়ে।
হেলিকপ্টারের দরজা দিয়ে একজন মাথা বের করে ছিল। সে নিহনকে তাড়া দিয়ে বলল, 'দেরি করো না। চট করে উঠে এসো।'
নিহন দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে আসে। ভেতরে পাশাপাশি কয়েকটা বসার জায়গা; একজন নিহনকে তার একটাতে বসার ইঙ্গিত করল। নিহন বসার সঙ্গে সঙ্গেই হেলিকপ্টারটা গর্জন করে ওপরে উঠে যেতে শুরু করে। নিহন জানালা দিয়ে দেখতে পায় কাটুস্কা এখনো হাত নাড়ছে। নিহন জানালা দিয়ে এই অন্য রকম মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।
হেলিকপ্টারের ভেতর একজন মানুষ নিহনের দিকে এগিয়ে আসে, হাতে একটা গ্লাস, গ্লাসে সৃচ্ছ একধরনের পানীয়। মানুষটা গ্লাসটি নিহনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও। খাও।'

নিহন মাথা নাড়ল, বলল, 'আমি কিছু খেতে চাই না।'
'তবু খাওয়া উচিত। তোমার শরীরে পানীয়ের অভাব হয়েছে, ছেলে।'
নিহন হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিজের কাছে নিয়ে এসে চুমুক দিল, ঝাঁঝালো একধরনের স্বাদ। নিহন কয়েক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করে খালি গ্লাসটি মানুষটার হাতে ফিরিয়ে দিল।
নিহন জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, সমুদ্রের নীল পানির ওপর দিয়ে হেলিকপ্টারটা ছুটে যাচ্ছে। সে কখনো কি ভেবেছিল যে সে একটা হেলিকপ্টারে উঠবে? নিহন নিজের ভেতরে একধরনের শিহরণ অনুভব করে।
নিহন হেলিকপ্টারের ভেতরে তাকাল, বড় হেলিকপ্টারে উন্মুক্ত অনেকখানি জায়গা, সুদৃশ্য কয়েকটা চেয়ার এবং ধবধবে সাদা টেবিল। দেয়ালে যন্ত্রপাতির একটা প্যানেল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নিহন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। হেলিকপ্টারটি পূর্ব দিকে যাওয়ার কথা, এখন যাচ্ছে দক্ষিণে।
নিহন ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে তোমরা কোথায় নামাবে? তোমরা দক্ষিণে যাচ্ছ কেন?'
মানুষটা কোনো কথা বলল না, তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। নিহন আবার জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় নামাবে?'
মানুষটির মুখে এবার মৃদু হাসি ফুটে ওঠে, সে আস্তে আস্তে বলে, 'তোমাকে কোথাও নামানো হবে না, ছেলে!'
নিহন চমকে উঠল, বলল, 'নামানো হবে না?'
'না। তোমাকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি।'
'কিন্তু কিন্তু–'
'কিন্তু কী?'
'কাটুস্কা নামের ওই মেয়েটি যে বলেছিল আমাকে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে।'
মানুষটা বলল, 'কাটুস্কা তা-ই জানে।'
'তোমরা ওই মেয়েটিকে মিথ্যা কথা বলেছ?'
মানুষটা শব্দ করে হাসল, 'যার সঙ্গে যেরকম কথা বলার প্রয়োজন তা-ই বলতে হয়।'
'তোমরা আমাকে নিয়ে কী করবে?'
'আমাদের জৈব ল্যাবে তোমাকে পরীক্ষা করা হবে।'
'কীভাবে পরীক্ষা করা হবে?'
'কাটাকুটি করে দেখবে মনে হয়–'
নিহন লাফিয়ে উঠতে গিয়ে আবিষ্কার করে তার হাতে-পায়ে কোনো জোর নেই। সে উঠতে পারছে না। একধরনের আতঙ্ক নিয়ে সে মানুষটার দিকে তাকাল; মানুষটা আবার তার দিকে তাকিয়ে হাসে, ফিসফিস করে বলে, নির্বোধ জলমানব, তোমার এখন ঘুমানোর কথা। তোমার পানীয়ের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। স্নায়ুগুলো কাজ করার কথা নয়–'
নিহন আবিষ্কার করল, সত্যি-সত্যি তার শরীরের সব স্নায়ু শিথিল হয়ে আছে। সে নড়তে পারছে না। নিহন ঘোলা চোখে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইল, সে এখনো কিছুই বিশ্বাস করতে পারছে না। ধীরে ধীরে তার চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসতে থাকে। নিহনের মনে হতে থাকে, কোনো কিছুতেই আর কিছু আসে যায় না।

৭.

খুব ধীরে ধীরে নিহনের জ্ঞান ফিরে আসে। তাকে একটা শক্ত টেবিলে শোয়ানো আছে। তার হাত-পা এবং মাথা শক্ত করে বাঁধা, শরীরটুকু নাড়াতে পারছে না। তার আশপাশে কিছু মানুষ আছে, তারা নিচু গলায় কথা বলছে। নিহন চোখ না খুলে তাদের কথা শোনার চেষ্টা করল। মোটা গলায় একজন বলল, 'তুমি নিশ্চিত এই জলমানবের শরীরে কোনো ভাইরাস নাই।'
মেয়ে কণ্ঠে একজন উত্তর দিল, 'না, নাই। সব পরীক্ষা করা হয়েছে। কোয়ান্টাম কম্পিউটার রিপোর্ট দিয়েছে।'
'তুমি নিজে দেখেছ সেই রিপোর্ট?'
'হ্যাঁ, দেখেছি।'
'আমি কোনো কিছু বিশ্বাস করি না। আমাদের এ রকম ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লাগাবে, কিন্তু সে জন্য আলাদা ইউনিট দেবে না এটা কেমন কথা?'

মেয়ে কণ্ঠ উত্তর দিল, 'এটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ না। সত্যি কথা বলতে কী, ঝুঁকিটা এই জলমানবের। আমাদের এখানে এক শ দশ রকম ভাইরাস। নির্ঘাত এর অসুখ হবে।'

মোটা কণ্ঠ উত্তর দিল, 'কিন্তু এই জলমানব যদি আমাদের আক্রমণ করে? এর শরীরটা দেখেছ? একটুও বাড়তি মেদ নেই, পুরোটা শক্ত মাংসপেশি। গায়ে নিশ্চয়ই মোষের মতো জোর।'

'না, এই জলমানব আক্রমণ করবে না। তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। যে ড্রাগ দেওয়া হয়েছে তার কারণে এত তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরে আসার কথা না। তা ছাড়া–'

তা ছাড়া কী?

'তা ছাড়া জলমানব খুব নিরীহ প্রাণী। তাদের সমাজে ভায়োলেন্স নেই।'

মোটা গলার মানুষটি বলল, 'ভায়োলেন্স নেই সেটা আবার কী রকম সমাজ?'

মেয়েটি বলল, 'সমাজ নিয়ে কথা বলার অনেক সময় পাবে। এখন তাকে স্ক্যান করানো শুরু করো।'

'ঠিক আছে।'

নিহনের খুব ইচ্ছা করছিল চোখ খুলে দেখে, কিন্তু সে চোখ বন্ধ করে রইল। সে অনুভব করে তাকে কোনো একটা যন্ত্রের ভেতর দিয়ে নেওয়া হচ্ছে, সে এক ধরনের অস্বস্তিকর উষ্ণতা এবং কম্পন অনুভব করে।

মেয়ে কণ্ঠটি বলল, 'দেখো দেখো, জলমানবের ফুসফুসটা দেখো। কত বড় দেখেছ?'

মোটা গলার মানুষটি বলল, 'আমার দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। কাজ করতে এসেছি, কাজ করে চলে যাব। যা দেখার সেটা দেখবে কোয়ান্টাম কম্পিউটার।'

'সে তো দেখছেই। সে দেখতে চাইছে বলেই তো আমরা স্ক্যান করছি।'

মোটা গলার মানুষটা বলল, 'আচ্ছা, শরীরের ভেতরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এ রকম স্পষ্ট দেখা যায়–এই মেশিনটা কাজ করে কেমন করে জানো?'

'উঁহু। আমাদের জানার কথা নয়, জানার প্রয়োজনও নাই। এই সব কোয়ান্টাম কম্পিউটারের মাথাব্যথা।'

নিহন সাবধানে চোখের পাতা খুলে যারা কথা বলছে তাদের দেখার চেষ্টা করল; একজন মোটাসোটা মানুষ, আরেকজন হালকা পাতলা মহিলা। স্ক্যানিং মেশিন কেমন করে কাজ করে তারা জানে না। নিহন জানে, সে পড়েছে। তাদের জানার দরকার নেই, কারণ কোয়ান্টাম কম্পিউটার সবকিছু জানে। জলমানবদের জানার দরকার আছে, কারণ তাদের কোয়ান্টাম কম্পিউটার নেই। কোনটা ভালো?

নিহন শুনতে পায় পুরুষমানুষ এবং মহিলাটি কথা বলতে বলতে একটু দূরে চলে যাচ্ছে, তখন সে খুব সাবধানে তার চোখ অল্প একটু খুলে দেখার চেষ্টা করল। যন্ত্রপাতি বোঝাই একটা ঘর, তার মাঝামাঝি একটা শক্ত ধাতব টেবিলে সে শুয়ে আছে। তার ওপর একটা বড় উজ্জ্বল আলো, সেদিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। চারপাশের যন্ত্রগুলোর দিকে সে লোভাতুর চোখে তাকাল, সে এগুলোর কথা পড়েছে, কখনো নিজের চোখে দেখবে ভাবেনি।

নিহন হঠাৎ একধরনের ক্লান্তি অনুভব করে। স্ক্যান করার জন্য শরীরের ভেতরে তেজস্ক্রিয় দ্রবণ ঢুকিয়ে দিয়েছে, সেগুলো স্তিমিত হতে একটু সময় নেবে। ততক্ষণ তার বিশ্রাম নেওয়ার কথা। হয়তো সেজন্য ঘুমের ওষুধ দিয়েছে, আবার তার চোখে ঘুম নেমে আসছে।

নিহনের ছাড়া-ছাড়া ভাবে ঘুম হলো, সমস্ত শরীর শক্ত করে বাঁধা; এর মধ্যে সত্যিকার অর্থে ঘুমানো যায় না। ক্লান্ত হয়ে ছাড়া-ছাড়াভাবে চোখ বুজে আসে, বিচিত্র সব সৃপ্ন দেখে তখন। একটা বিশাল অক্টোপাস এসে তাকে পেঁচিয়ে ধরেছে, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে, তখন অক্টোপাসটি পরিষ্কার মানুষের গলায় বলল, 'এদের বুদ্ধিমত্তা নিম্নশ্রেণীর।'

নিহনের ঘুম ভেঙে যায়, তার মাথার কাছে দুজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, একজনের বড় বড় লাল চুল অন্যজনের চুল ছোট করে ছাঁটা। লাল চুলের মানুষটি বলল, 'কেন বুদ্ধিমত্তা নিম্নশ্রেণীর হয়? এরা তো একসময় আমাদের মতো মানুষই ছিল।'

'বিবর্তন।'

'বিবর্তন?'

'হ্যাঁ, বিবর্তন যেরকম পজিটিভ হতে পারে, সেরকম নেগেটিভও হতে পারে। আমাদের বিবর্তন হচ্ছে পজিটিভ। যতই দিন যাচ্ছে আমরা আরো পূর্ণ মানুষ হচ্ছি, ভালো মানুষ হচ্ছি। এরা যাচ্ছে উল্টো দিকে।'

লাল চুলের মানুষটি বলল, 'হ্যাঁ, সেটাই স্বাভাবিক। বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার না করলে সেটা কমে যায়। এদের বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করার সুযোগ নেই। জীবনের মান খুব নিচু। অনেকটা বন্য জন্তুর মতো। সবকিছুই হচ্ছে সহজাত প্রবৃত্তি।'

কালো চুলের মানুষটি বলল, 'হ্যাঁ, শরীরটা দেখলেই অনুমান করা যায়। দেখেছ এর শরীরে একটা জন্তু জন্তু ভাব আছে?'

'হ্যাঁ। খুব সাবধান! এরা নাকি আমাদের কথা মোটামুটি বুঝতে পারে। প্রথমেই বুঝিয়ে দেওয়া যাক আমরা কী করতে যাচ্ছি।'

লাল চুলের মানুষটা এবার নিহনের গায়ে ছোট একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, 'এই ছেলে। এই।'

নিহন চোখ খুলে তাকাল। লাল চুলের মানুষটা বলল, 'তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ?'

নিহন মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, পারি।'

'চমৎকার! আমরা তোমার কিছু জিনিস পরীক্ষা করব। তোমাকে সহযোগিতা করতে হবে। বুঝেছ?'

নিহন আবার মাথা নাড়ল, বলল, 'বুঝেছি।'

'সেটা পরীক্ষা করার জন্য তোমার হাত ও পায়ের বাঁধন খুলে দিতে হবে। বুঝেছ?'

'বুঝেছি।'

'কিন্তু হাত-পা খুলে দেওয়ার পর তুমি যেন আমাদের হঠাৎ করে আক্রমণ করে না বস–'

'আমি তোমাদের আক্রমণ করব না।'

'আমরা বিষয়টা নিশ্চিত করতে চাই। সে জন্য আমরা তোমার শরীরে একটা প্রোব লাগাব। তুমি যদি বিপজ্জনক কিছু কর তাহলে আমরা একটা সুইচ টিপে ধরব, তখন তুমি একটা ভয়ঙ্কর ইলেকট্রিক শক খাবে।'

নিহন কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইল। মানুষটা বলল, 'ইলেকট্রিক শক কথাটা তুমি হয়তো শোন নাই, তাই এই কথাটার অর্থ তুমি বুঝতে পারবে না। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করো, এটা ভয়ানক একটা জিনিস, একবার খেলে সারা জীবন মনে থাকবে।'

কালো চুলের মানুষটা এবার এগিয়ে আসে, নিহনের হাতে ছোট একটা স্ট্র্যাপ দিয়ে প্রোবটা বেঁধে দিয়ে বলল, 'জিনিসটা পরীক্ষা করে দেখা যাক।'

হাতে ধরে রাখা একটা সুইচ টিপে ধরতেই নিহন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আর্তচিৎকার করে উঠল। সমস্ত শরীর ইলেকট্রিক শকে ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে। লাল চুলের মানুষটার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল, সে মাথা নেড়ে বলল, 'বুঝেছ? এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক শক।'

নিহন মাথা নাড়ল, বলল, 'বুঝেছি।'

'কাজেই তুমি যদি উল্টাপাল্টা কোনো কাজ করো তাহলেই ঘ্যাচ করে এই সুইচ টিপে ধরব, সঙ্গে সঙ্গে তুমি ইলেকট্রিক শক খাবে। বুঝেছ?'

মানুষ দুজন তখন নিহনের বাঁধন খুলে দেয়, নিহন তার টেবিলে বসে চারদিকে ঘুরে তাকাল। নানারকম যন্ত্রপাতি গুঞ্জন করছে, সেগুলো দেখে নিহন মুগ্ধ হয়ে যায়। আহা! সে যদি এ রকম কয়েকটা যন্ত্র নিয়ে যেতে পারত তাহলে কী চমৎকারই না হতো!

লাল চুলের মানুষটা বলল, 'আমরা তোমার কিছু জিনিস পরীক্ষা করব। তুমি কীভাবে চিন্তা করো তার একটা ধারণা নেব। বুঝেছ?'

নিহন মাথা নাড়ল, বলল, 'বুঝেছি।'

আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব, তুমি সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। যদি প্রশ্ন বুঝতে না পার আমাদের জিজ্ঞেস করো।'

'করব।'

'খবরদার! অন্য কিছু করার চেষ্টা করো না।'

'না। করব না।'

লাল চুল এবং কালো চুলের মানুষ দুটি কিছু ধাতব ব্লক, বোর্ড, নানা ধরনের জ্যামিতিক আকারের নকশা বের করে নিহনের পরীক্ষা নেওয়া শুরু করল। নিহন সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে, তারা তাদের ডলফিনগুলোর বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করার জন্য যে পরীক্ষা করে, এই পরীক্ষাটা অনেকটা সে রকম। মানুষ দুজন ধরেই নিয়েছে নিহনের বুদ্ধিমত্তা অত্যন্ত নিম্নস্তরের, প্রায় পশুর কাছাকাছি।

নিহন তাদের নিরাশ করল না। ঠিক কী কারণ জানা নেই, নিহনের মনে হলো সে যদি এই মানুষ দুটোকে ধারণা দেয় যে আসলেই তার বুদ্ধিমত্তা নিম্নস্তরের তাহলে সেটা পরে কাজে লাগতে পারে। নিহন তাই খুব চিন্তা-ভাবনা করে পুরোপুরি নির্বোধের মতো আচরণ করতে শুরু করল।

মানুষ দুজন গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে ফিসফিস করে নিজেদের ভেতর কথা বলে। নিহন শুনল, লাল চুলের মানুষটি বলল, 'এর মানসিক বয়স ছয় থেকে সাত বছরের কাছাকাছি।'
কালো চুলের মানুষটি বলল, 'দশ পর্যন্ত গুনতে পারে। যোগ কী তার ধারণা আছে। কিন্তু বিয়োগ করতে পারে না।'
'ভাষাও খুব দুর্বল। নিজেকে খুব ভালো করে প্রকাশ করতে পারে না।'
'কোথাও মনোযোগ দিতে পারে না–একটা জিনিস একটানা বেশি চিন্তা করতে পারে না।'
লাল চুলের মানুষটা বলল, 'কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ভবিষ্যদ্বাণী পুরোপুরি মিলে গেছে।'
'হ্যাঁ। পুরোপুরি মিলে গেছে। জলমানবের এই প্রজাতি ধীরে ধীরে একধরনের জন্তুতে পরিণত হচ্ছে। এদের ভবিষ্যৎটুকু দেখতে খুব কৌতূহল হচ্ছে।'
'এদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমরা যেরকম আমাদের যেকোনো কাজের জন্য কোয়ান্টাম কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারি, তারা তো সেটা করতে পারে না।'
নিহন একটাও কথা না বলে চুপচাপ বসে রইল। সে চোখেমুখে একধরনের ভাবলেশহীন ভঙ্গি ফুটিয়ে চোখের কোনা দিয়ে সবকিছু লক্ষ করে।
মানুষ দুজন কোয়ান্টাম কম্পিউটারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের তথ্য পাঠাতে থাকে। কিছু রিপোর্ট পরীক্ষা করে এবং সবশেষে যোগাযোগ মডিউল দিয়ে কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলে।
নিহনকে কিছু খাবার দেওয়া হলো। তার খিদে নেই, বিস্বাদ খাবার, তবু সে জোর করে খেয়ে নিল। তাকে একটা বাথরুম ব্যবহার করতে দেওয়া হলো, সেখানে দীর্ঘসময় সে পানির ধারার নিচে দাঁড়িয়ে রইল। তার দৈনন্দিন জীবন কাটে পানির খুব কাছাকাছি–একা দীর্ঘসময় সে পানি থেকে দূরে থাকেনি। সে বুঝতে পারছিল তার পুরো শরীর পানির জন্য খাঁ খাঁ করছিল। পুরো শরীর পানিতে ভিজিয়ে সে যখন আগের ঘরটিতে ফিরে এল, মানুষ দুজন তাকে দেখে খুব অবাক হলো। বলল, 'তোমার শরীর ভিজে।'
'হ্যাঁ।'
'শরীর মুছে নাও।'
'না।' নিহন মাথা নাড়ল, 'আমি ভেজাই থাকতে চাই।'
'কেন?'
'আমার ভেজা থাকতে ভালো লাগে।'
'কী আশ্চর্য!'
নিহন কোনো কথা বলল না। মানুষ দুজন একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকাল। লাল চুলের মানুষটা বলল, 'আমাদের মনে হয় বিষয়টা কোয়ান্টাম কম্পিউটারকে জানানো দরকার।'
'হ্যাঁ।' কালো চুলের মানুষটি মাথা নাড়ল, বলল, 'জানানো দরকার।'
নিহন দেখল মানুষ দুজন ঘরের এক কোনায় গিয়ে কিছু যন্ত্রপাতির সামনে বসে কিছু একটা লিখতে থাকে। তারপর আবার নিহনের কাছে ফিরে আসে। লাল চুলের মানুষটা বলল, 'তোমাকে আরও কিছু পরীক্ষা করতে হবে।'
নিহন কোনো কথা বলল না। লাল চুলের মানুষটা বলল, 'পানির ভেতরে তুমি কেমন থাক, কী কর, কোয়ান্টাম কম্পিউটার সেটা জানতে চায়।
নিহন এবারও কোনো কথা বলল না। লাল চুলের মানুষটা বলল, 'তোমাকে একটা বড় পানির ট্যাংকে রাখা হবে, তোমার শরীরে নানা রকম মনিটর লাগানো হবে, তোমার রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ মাপা হবে–এটা হবে অনেক দীর্ঘ পরীক্ষা।'
নিহন একটা নিঃশ্বাস ফেলল, বলল, 'ঠিক আছে।'

ঘণ্টাখানেক পরে বড় একটা চৌবাচ্চায় পানির মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হলো। চারপাশে কয়েকজন মানুষ তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করতে থাকে। যখন তাকে পানির নিচে যেতে বলে, নিহন পানির নিচে চলে যায়। যখন তাকে ভেসে উঠতে বলে, তখন সে আবার ভেসে ওঠে। মনিটরে তার শরীরের তাপ, রক্তচাপ, রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ, হৃদস্পন্দন এবং এ রকম অসংখ্য খুঁটিনাটি বিষয় মাপতে থাকে। যে মানুষগুলো পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিল, তারা কোয়ান্টাম কম্পিউটারের জন্য তথ্য সংগ্রহ করছিল, তথ্যের মধ্যে বিস্ময়কর কোনো বিষয় আছে কি না সেটা বুঝতে পারছিল না। তথ্যগুলো যে বিস্ময়কর সেটা কোয়ান্টাম কম্পিউটারের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল, কিন্তু এই অসাধারণ ক্ষমতাশালী কম্পিউটারটি অসাধারণ জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারলেও তার অবাক হওয়ার

ক্ষমতা ছিল না।

পরদিন জরুরি একটা সভা বসেছে। কোয়ান্টাম কম্পিউটারের অনুরোধেই এই সভাটি ডাকা হয়েছে। সভার শুরুতে প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান রিওন বললেন, তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের সভা শুরু করছি। আজকের সভায় তোমাদের অন্য সবার সঙ্গে সঙ্গে কোয়ান্টাম কম্পিউটার সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থাকবে। আমাদের সঙ্গে সে যেন সহজভাবে কথা বলতে পারে সে জন্য আজকে তার ইন্টারফেসের সঙ্গে একটা কণ্ঠস্বর সিনথেসাইজার লাগানো হয়েছে।'

একটা কালো টেবিল ঘিরে বসে থাকা সামাজিক দপ্তরের প্রধান, আইন বিভাগের প্রধান, শিক্ষা বিভাগের প্রধান, স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান একটু নড়েচড়ে বসল। সব গুরুত্বপূর্ণ সভাতেই কোয়ান্টাম কম্পিউটার উপস্থিত থাকে তবে সেটা হয় নীরব উপস্থিতি। সভার কথাবার্তাগুলো কোয়ান্টাম কম্পিউটারের তথ্যভাণ্ডারে সরাসরি চলে যায়। সক্রিয়ভাবে কোয়ান্টাম কম্পিউটার খুব বেশি উপস্থিত থাকে না।

রিওন বললেন, 'কোয়ান্টাম কম্পিউটার, তুমি কি আমাদের উদ্দেশে কিছু বলতে চাও?'

কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ভাবলেশহীন শুষ্ক গলার সুর শোনা গেল, 'তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তোমাদের সেবা করার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।'

'চমৎকার!' রিওন বললেন, 'আমরা আমাদের কিছু পরিসংখ্যান নিয়ে শুরু করছি। আমি প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান, কিন্তু প্রতিরক্ষার কাজটি সব সময়ই করতে হয় ভেতর থেকে। আমাদের তরুণসমাজকে নিয়ে আমি খুব চিন্তিত। শতকরা পনেরো ভাগ তরুণ-তরুণী আত্মহত্যা করছে। শতকরা তিরিশ ভাগ মাদকাসক্ত। শতকরা চল্লিশ ভাগ হতাশাগ্রস্ত। বলা যায়, মাত্র পনেরো ভাগ মোটামুটিভাবে স্বাভাবিক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরো অবস্থাটা আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

শিক্ষা বিভাগের প্রধান বললেন, 'একটা সময় ছিল, লেখাপড়া এবং জ্ঞানচর্চার পুরো বিষয়টা ছিল খুব কঠিন। কোয়ান্টাম কম্পিউটার আসার পর থেকে পুরো বিষয়টা এখন হয়েছে খুব সহজ। কিন্তু তার পরও তরুণ-তরুণীদের লেখাপড়ায় আগ্রহ নেই। তারা কিছু শিখতে চায় না। কিছু জানতে চায় না।'

সামাজিক দপ্তরের প্রধান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কোয়ান্টাম কম্পিউটার তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'মানুষের পরিসংখ্যান নিয়ে একটা ভীতি আছে। আমি কোয়ান্টাম কম্পিউটার হিসেবে তোমাদের আশ্বস্ত করতে চাই, পরিসংখ্যান নিয়ে তোমরা বিচলিত হয়ো না। তোমরা তোমাদের মূল লক্ষ্য এবং মূল উদ্দেশ্যটার দিকে নজর দাও। যতক্ষণ পর্যন্ত মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের দিকে তোমরা অগ্রসর হতে পারবে, তোমাদের ভয়ের কিছু নেই।'

রিওন ভুরু কুচকে বলল, 'কিন্তু আমরা কি অগ্রসর হতে পারছি?'

কোয়ান্টাম কম্পিউটার শুষ্ক স্বরে বলল, 'পারছি। তোমাদের জীবনের মান আগের থেকে উন্নত হয়েছে। আমরা আমাদের শক্তির প্রয়োজন প্রায় মিটিয়ে ফেলেছি। শক্তির অভাব ঘুচিয়ে ফেলাই হচ্ছে মানবসভ্যতার সত্যিকারের লক্ষ্য। যদি অফুরন্ত শক্তি থাকে তাহলে আমরা যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারব।'

সামাজিক দপ্তরের প্রধান বিড়বিড় করে বললেন, 'কিন্তু নতুন প্রজন্মের মনে যদি আনন্দ না থাকে, সুখ না থাকে তাহলে অফুরন্ত শক্তি দিয়ে আমরা কী করব?'

কোয়ান্টাম কম্পিউটার বলল, 'এই একটি বিষয়ে আমি তোমাদের বুঝতে পারি না। আনন্দ এবং সুখ। আমি আগেও লক্ষ করেছি, আনন্দ এবং সুখ কথাগুলো মানুষ অনেক সময় বিপরীত অর্থে ব্যবহার করে। আমার ধারণা যে পরিবেশে মানুষের সুখী হওয়ার কথা, অনেক সময়ই সেই পরিবেশে তারা অসুখী। যেই পরিবেশে তাদের আনন্দ পাওয়ার কথা, সেই পরিবেশে অনেক সময় তাদের মানসিক যন্ত্রণা হয়। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারি না।'

রিওন হাসার চেষ্টা করে বলল, 'তোমার সেটা নিয়ে বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, কোয়ান্টাম কম্পিউটার। মানুষ নিজেও অনেক সময় সেটা বুঝতে পারে না।'

সামাজিক দপ্তরের প্রধান বিড়বিড় করে বললেন, 'মানুষকে বোঝা এত সহজ নয়।'

শিক্ষা দপ্তরের প্রধান বললেন, 'নতুন প্রজন্মের মধ্যে উৎসাহের খুব অভাব, তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য সব সময় আমাদের নতুন কিছু খুঁজে বের করতে হয়। কিছুদিন আগে একটা কনসার্টের আয়োজন করা হয়েছে, সেই কনসার্টে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন দিয়ে মস্তিষ্কে রেজোনেন্স করা হয়েছে। এর আগে আমরা নতুন একটা পানীয় বাজারে ছেড়েছিলাম–খুব হালকাভাবে স্নায়ু উত্তেজক। নতুন ফ্যাশন বের করতে হয়, নতুন গ্যাজেট বের করতে হয়।'

কোয়ান্টাম কম্পিউটার শুষ্ক গলায় বলল, 'আমার মনে হয় নতুন প্রজন্মকে ব্যস্ত রাখার জন্য নতুন একটা প্রজেক্ট হাতে

নেওয়া যায়।'

'কী প্রজেক্ট?'

'আমাদের হাতে একটা জলমানব আছে।'

রিওন চমকে উঠে বললেন, 'কী বললে? জলমানব?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কোথা থেকে জলমানব পেয়েছ?'

যে জলমানবটাকে তুমি তার এলাকায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলে, আমি সেটাকে পরীক্ষা করার জন্য জৈব ল্যাবরেটরিতে নিয়ে এসেছি।'

রিওন কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারলেন না, কয়েকবার চেষ্টা করে বললেন, 'কিন্তু-কিন্তু আমি আমার মেয়েকে কথা দিয়েছিলাম সেই জলমানবটাকে তার এলাকায় ফিরিয়ে দেব।'

'আমি জানি।' কোয়ান্টাম কম্পিউটার শুষ্ক গলায় বলল, 'কিন্তু এই জলমানবটা আমাদের প্রয়োজন ছিল। জলমানবদের বিবর্তন নিয়ে আমাদের কিছু ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, সেটা পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন ছিল।'

রিওন অধৈর্য গলায় বললেন, 'কিন্তু আমি আমার মেয়ের সামনে মিথ্যুক প্রমাণিত হয়েছি।'

'তোমার মেয়ে যদি কখনো সত্যি কথাটা জানতে পারে তাহলে তুমি মিথ্যুক প্রমাণিত হবে। তার সত্যি কথাটা জানার কোনো প্রয়োজন নেই।'

রিওন হতাশার ভান করে বললেন, 'কিন্তু কিন্তু–'

কোয়ান্টাম কম্পিউটার কঠিন গলায় বলল, 'তোমরা মানুষেরা ছোট বিষয় নিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়। প্রতিদিন খাবারের জন্য তোমরা শত শত প্রাণী হত্যা করো। অথচ বিশেষ প্রয়োজনে একটি জলমানব ধরে নিয়ে আসা হলে সেটি তোমাদের কাছে বাড়াবাড়ি মনে হয়?'

রিওন মাথা নাড়লেন, বললেন, 'কোয়ান্টাম কম্পিউটার, তুমি বুঝতে পারছ না। মানুষের ভেতরে যারা আপনজন, তাদের ভেতরে একটা সম্পর্ক থাকে। সেই সম্পর্কটা হচ্ছে বিশ্বাসের সম্পর্ক। একজন মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক নষ্ট করে না। নষ্ট করতে চায় না–'

কোয়ান্টাম কম্পিউটার রিওনকে বাধা দিয়ে বলল, 'আমার একটা সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব পালন করার জন্য আমাকে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তোমাদের সেই সিদ্ধান্তগুলো মেনে নিতে হবে। তোমরা নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারবে না যে আমি এখন পর্যন্ত কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিইনি। কিংবা এখন পর্যন্ত আমার কোনো ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি।'

কালো টেবিল ঘিরে বসে থাকা সবাই সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। কোয়ান্টাম কম্পিউটার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, 'জলমানব নিয়েও আমার সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। তারা পানিতে অত্যন্ত কঠিন একটা জীবন যাপন করে, সেই জীবনে কোনো সৃজনশীলতা নেই। কাজেই যতই সময় যাচ্ছে ততই তাদের বুদ্ধিমত্তা কমে আসছে। বিবর্তন উল্টো দিকে গেলে কী হতে পারে জলমানব হলো তার প্রমাণ। জলমানবটি ধরে নিয়ে এসে আমি তাকে পরীক্ষা করে দেখেছি। বুদ্ধিমত্তার নিনীষ স্কেলে সে মাত্র প্রথম স্কেলে। তার বয়সী একজন সাধারণ মানুষ থাকে সপ্তম স্কেলে। জ্ঞান-বিজ্ঞান দূরে থাকুক, সাধারণ সংখ্যা পর্যন্ত সে জানে না। ছোট সংখ্যা যোগ করতে পারে, বিয়োগ করতে পারে না। এই মুহূর্তে আমরা তাদের জলমানব বলে সম্বোধন করি, আগামী শতক পরে তাদের জলজ প্রাণী বলে সম্বোধন করা হবে।'

শিক্ষা দপ্তরের প্রধান কোয়ান্টাম কম্পিউটারকে মনে করিয়ে দিল, 'তুমি জলমানবকে নিয়ে নতুন প্রজন্মের জন্য একটি প্রজেক্ট তৈরির কথা বলেছিলে।'

'হ্যাঁ, আমি সেই বিষয়ে আসছি।' কোয়ান্টাম কম্পিউটার তার ভাবলেশহীন গলায় একঘেয়ে সুরে বলল, 'জলমানব বুদ্ধিমত্তার দিকে অনেক পিছিয়ে গেলেও শারীরিকভাবে একটা চমকপ্রদ ক্ষমতার অধিকারী। এই জলমানবটি দীর্ঘসময় পানির নিচে নিঃশ্বাস না নিয়ে থাকতে পারে। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, এই জলমানবটি পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন তার ত্বকের ভেতর দিয়ে নিতে পারে। খুব বেশি পরিমাণে নয়, কিন্তু কয়েক মিনিট বেশি বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট। কাজেই আমার মনে হয়, এই জলমানবটি ব্যবহার করে তরুণ প্রজন্মের জন্য একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যায়।'

উপস্থিত যারা ছিল তারা সবাই সম্মতির ভঙ্গি করে মাথা নাড়তে থাকে। শুধু রিওন বললেন, 'আমার মেয়ে এখনো আসল ব্যাপারটি জানে না। প্রদর্শনী হলে নিশ্চিতভাবে জেনে যাবে। আমি তখন তার সামনে মুখ দেখাতে পারব না।'

কোয়ান্টাম কম্পিউটার রিওনের আপত্তিটুকু গায়ে মাখল না, বলল, 'সামুদ্রিক কোনো প্রাণীর সঙ্গে এই জলমানবের যুদ্ধের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, তরুণ প্রজন্ম সচক্ষে দেখতে পেলে সেটি খুব উপভোগ করবে।'
শিক্ষা দপ্তরের প্রধান বললেন, 'হ্যাঁ, সেরকম একটা কিছু করতে হবে। শুধু একটা প্রদর্শনী হলে কেউ যাবে না। আজকালকার ছেলেমেয়েরা মিউজিয়াম বা চিড়িয়াখানাতেও যায় না। তারা সাধারণ কিছু দেখে আনন্দ পায় না। সেখানে ভায়োলেন্স থাকতে হয়। উত্তেজনা থাকতে হয়। মস্তিষ্কে স্টিমুলেশন থাকতে হয়।'
সামাজিক দপ্তরের প্রধান বিড়বিড় করে বললেন, 'আমাদের পক্ষে এ রকম একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করা সম্ভব হবে না। বিষয়টার দায়িত্ব কাউকে দিতে হবে।'
কথাটা লুফে নিয়ে কোয়ান্টাম কম্পিউটার বলল, 'হ্যাঁ। আমরা এই জলমানবকে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রয় করে দিতে পারি; তারা একে ব্যবহার করে যা করা দরকার তা-ই করতে পারবে। যেখানে অর্থের বিনিময় নেই সেখানে সৃজনশীলতা নেই।'
রিওন কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইলেন। হঠাৎ করে সভায় কথা বলার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন।

৮.

ঘরের দরজায় কার যেন ছায়া পড়ল। কায়ীরা মাথা তুলে তাকিয়ে দেখে কমবয়সী কয়েকজন ছেলেমেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ছেলেমেয়েগুলোকে সে চিনতে পারে। এরা নিহনের বন্ধু। ডলফিনের ওপর চেপে যে দলটি ঘুরে বেড়ায় এরা সেই দলের ছেলেমেয়ে।
কায়ীরা তার হাতের কাগজটা টেবিলে রেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?'
'আমরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, কায়ীরা।
'সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। এসো।'
ছেলেমেয়েগুলো কায়ীরার ছোট ঘরটাতে ঢুকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে পড়ে। কায়ীরা নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে থাকে, তারা কী জন্য এসেছে সে ভালো করেই জানে। ছেলেমেয়েগুলোর ভেতর যে একটু বড়, সুদর্শন, ক্রিহা ভনিতা না করে কথা বলতে শুরু করে, 'কায়ীরা, আমাদের নিহনকে স্থলমানবেরা ধরে নিয়ে গেছে।'
কায়ীরা নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। ক্রিহা বলল, 'ঘটনার সময় নাইনা সেখানে ছিল, সেখানে কী ঘটেছে আমরা সেটা নাইনার মুখে শুনেছি।'
কায়ীরা মাথা নাড়ল, বলল, 'আমরাও শুনেছি।'
'এটা কেমন করে হতে পারে, স্থলমানবেরা ইচ্ছা করলেই আমাদের কাউকে খুন করে ফেলবে? আমাদের কাউকে ধরে নিয়ে যাবে?'
কায়ীরা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল, 'এটা হতে পারে না, কিন্তু তবুও হচ্ছে। আমি এ রকম আরও অসংখ্য উদাহরণ দিতে পারি যেগুলো হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়, কিন্তু হচ্ছে।'
নাইনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'আমরা সেগুলো চুপচাপ মেনে নেব?'
কায়ীরা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী করতে চাও, নাইনা?'
'প্রতিশোধ নিতে চাই।'
'প্রতিশোধ?'
'হ্যাঁ। আমরা প্রতিশোধ নিতে চাই।'
কায়ীরা মৃদু গলায় বলল, 'তুমি কীভাবে প্রতিশোধ নিতে চাও?'
ছেলেমেয়েগুলো কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, পেছন থেকে একজন বলে, 'স্থলমানবেরা যদি আমাদের একজনকে ধরে নিয়ে যায় তাহলে আমরাও তাদের একজনকে ধরে নিয়ে আসব। স্থলমানবেরা যদি আমাদের একজনকে খুন করে তাহলে আমরাও তাদের একজনকে খুন করব।'
কায়ীরা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে; তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'মানুষ দু কারণে প্রতিশোধ নেয়। এক. প্রতিশোধ নিয়ে একধরনের মানসিক শান্তি পাওয়া। দুই. প্রতিশোধ নিয়ে একধরনের সংকেত পাঠানো যে ভবিষ্যতে কিছু একটা করলে তোমাদের এই অবস্থা হবে। তোমরা কী জন্য প্রতিশোধ নিতে চাইছ?'
ক্রিহা একটু ইতস্তত করে বলল, 'মনে হয় দুই কারণেই। আমরা দুটোই করতে চাই।'
'তোমাদের কি সেই ক্ষমতা আছে?'
একজন সোজা হয়ে বসে বলল, 'আছে।'

'তুমি জানো, স্থলমানবদের কত রকম অস্ত্র আছে?'
'জানি। আমি অস্ত্রকে ভয় পাই না। আসলে–'
'আসলে কী?'
'আসলে আমি মৃত্যুকেও ভয় পাই না। দরকার হলে আমি প্রাণ দেব–'
কায়ীরা এবার হেসে ফেলল, বলল, 'প্রাণ যে কী মূল্যবান একটা জিনিস সেটা তোমরা জান না। এত সহজে প্রাণ দেওয়ার কথা বলো না। প্রাণটুকু থাকলে ভবিষ্যতে এক শ একটা কাজ করা যায়।'
ক্রিহা বলল, 'তাহলে তুমি কী ঠিক করলে, কায়ীরা?'
'আমি এখনো কিছু ঠিক করিনি। তোমাদের সঙ্গে কথা হওয়ার দরকার ছিল। মানুষের বয়স যখন কম থাকে তখন তারা একভাবে চিন্তা করে, যখন বয়স বেশি হয় তখন অন্যভাবে চিন্তা করে। দুটোই জানার দরকার আছে।'
নাইনা জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কি আমরা প্রতিশোধ নেব, কায়ীরা?'
'আমি তো বলেছি সেটা এখনো ঠিক করিনি। পৃথিবীর মানুষ আমাদের পানিতে ঠেলে দেওয়ার পর প্রায় দুই শতাব্দী পার হয়ে গেছে। আমরা এখনো টিকে আছি। স্থলমানবেরা আমাদের শেষ করে দিতে না চাইলে আমরা টিকে থাকব। তাই আমাদের খুব ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমাকে ভাববার একটু সময় দাও তোমরা।'
ছেলেমেয়েগুলো একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায়। কায়ীরা টেবিল থেকে একটা কাগজ তুলে এনে বলল, 'আমি খুব খুশি হয়েছি যে তোমরা আমার কাছে এসেছ। প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বলছ। তোমাদের এই বয়সে তোমরা এত বড় অবিচার মুখ বুঝে সহ্য করলে খুব ভুল হতো। নিহনের জন্য তোমাদের ভালোবাসাটুকু আমি খুব সম্মান দিচ্ছি। আমরা পৃথিবীতে বেঁচে আছি শুধুই এই একটি কারণে, মানুষের জন্য মানুষের ভালোবাসার কারণে।'
নাইনা ভাঙা গলায় বলল, 'তোমার কী মনে হয়, কায়ীরা, নিহন কি বেঁচে আছে?'
'জানি না। ওখানে ডলফিনদের একটা দল ছিল, তারা বলেছে নিহনকে মারেনি। ধরে নিয়েছে। সেটা সুসংবাদ।'
'কিন্তু ধরে নিয়ে তো কিছু একটা করে ফেলতে পারে।'
'হ্যাঁ। তা পারে। কিন্তু তবু আমরা আশা নিয়ে থাকব। সমুদ্রের সব ডলফিনকে খবর দেওয়া আছে– যদি তারা নিহনকে দেখে তাকে যেন সাহায্য করে।'
ক্রিহা বলল, 'কায়ীরা।'
'বলো, ক্রিহা।'
'আমরা কি স্থলমানবদের একটা খবর পাঠাতে পারি না? তাদের বলতে পারি না নিহনকে ফেরত দিতে?'
'পারি। কিন্তু সেই খবর পাঠালে লাভ হবে না ক্ষতি হবে, আমরা জানি না। একটু ভেবে দেখতে দাও।'
'তুমি যদি কোনো খবর পাঠাতে চাও আমি সেই চিঠি নিয়ে যাব, কায়ীরা।'
'ঠিক আছে, ক্রিহা। আমি জানি তোমার অনেক সাহস।'
'যদি অন্য কিছুও করতে চাও আমাদের বলো।'
কায়ীরা মাথা নাড়ল, বলল, 'বলব।' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'তোমরা তো জানো এই পৃথিবীতে এখন আমাদের বেঁচে থাকার একটাই উপায়। সেটা হচ্ছে আমাদের মেধা। তোমরা সেটা ভুলবে না। তোমাদের শিখতে হবে। সবকিছু শিখতে হবে। জানতে হবে। বিদ্যাবুদ্ধিতে স্থলমানবদের হারাতে হবে, তা না হলে আমরা কিন্তু শেষ হয়ে যাব।'

৯.

কাটুস্কা ঘর থেকে বের হতে গিয়ে থেমে গেল, তার বাবার ঘরে আলো জ্বলছে। এ রকম সময় কখনো তার বাবা বাসায় থাকে না, আজকে বাসায় আছেন কেন কে জানে। সে বাবার ঘরে উঁকি দিল, বাবা টেবিলের সামনে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন, বসার ভঙ্গিটা কেমন যেন বিষণ্ণ। কাটুস্কা মৃদু গলায় ডাকল, 'বাবা।'
রিওন মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন, 'কে, কাটুস্কা?'
'হ্যাঁ, বাবা।'
'কী খবর, তুমি কোথায় যাচ্ছ?'
'নগরকেন্দ্রে, বাবা। আজকে নতুন কনসার্ট এসেছে, তার সঙ্গে নতুন জলনৃত্য।'
'জলনৃত্য?'
'হ্যাঁ, বাবা। বিজ্ঞাপন দেখনি? নতুন এক ধরনের জলজ প্রাণীর খেলা, খুব নাকি উত্তেজনাপূর্ণ।'

রিওনকে হঠাৎ কেমন জানি ক্লান্ত দেখায়। কাটুস্কা দুশ্চিন্তিত মুখে বলল, 'বাবা, তোমার শরীর ভালো আছে?'
'হ্যাঁ, মা। আমার শরীর ভালো আছে।'
'তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'
'হ্যাঁ। আমি আসলে একটু ক্লান্ত।'
'কেন, বাবা, তুমি তো কখনো ক্লান্ত হও না। এখন কেন ক্লান্ত হয়েছ?'
রিওন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'জানি না কেন। হঠাৎ করে কেন জানি ক্লান্তি লাগছে। সবকিছু নিয়ে একধরনের ক্লান্তি।' গলার সুর পাল্টে বললেন, 'বুঝলি কাটুস্কা, পৃথিবীটা খুব জটিল। এখানে বেঁচে থাকাটা আরও জটিল।'
কাটুস্কা একটু অবাক হয়ে বলল, 'কেন, বাবা? তুমি এ রকম কথা কেন বলছ?'
'জীবনটা ঠিক করে চালিয়েছি কি না মাঝে মাঝে খুব সন্দেহ হয়। সবকিছু ঠিক করে করার পরও কোথায় কোথায় জানি গোলমাল হয়ে যায়।'
কাটুস্কা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, রিওন তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'থাকুক এসব। যেখানে যাচ্ছিলে যাও। উপভোগ করে এসো।'
কাটুস্কা বাবার ঘর থেকে বের হয়ে আসে। ভেতরে কী যেন খচখচ করছে, ঠিক কী হচ্ছে সে বুঝতে পারছে না। কিছু একটা কোথাও যেন ভুল হয়ে গেছে, কেন হয়েছে কীভাবে হয়েছে কেউ সেটা ধরতে পারছে না।

নগরকেন্দ্রে কমবয়সী ছেলেমেয়েরা এসে ভিড় করেছে। কাটুস্কা তার বন্ধুবান্ধবদের খুঁজে বের করল। এক কোনায় দলবেঁধে দাঁড়িয়ে হৈচৈ করছিল, কাটুস্কাকে দেখে সবাই হৈহৈ করে উঠল। মাজুর বলল, 'কী খবর, কাটুস্কা, তোমার মুখ এত গম্ভীর কেন? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি কনসার্ট শুনতে আসনি, তুমি কারো মৃত্যুসভায় এসেছ!'
খুব মজার একটা কথা বলেছে এ রকম ভঙ্গি করে সবাই হি হি করে হাসতে থাকে। কাটুস্কা বলল, 'কনসার্ট এখনো শুরু হয়নি। যখন শুরু হবে তখন হয়তো এটা শোকসভার মতোই মনে হবে।'
দ্রীমন মুখ গম্ভীর করে বলল, 'না না। তুমি কী বলছ, কাটুস্কা? আমরা কত ইউনিট খরচ করে টিকিট করেছি দেখেছ? এতগুলো ইউনিট নিয়ে ভালো কিছু দেখাবেই।'
সবাই স্টেজের দিকে তাকাল, সেখানে বিশাল একটা অ্যাকুয়ারিয়াম, তার ভেতর ভয়ঙ্করদর্শন কয়েকটা হাঙর মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। রঙিন আলোতে পুরো অ্যাকুয়ারিয়ামটি আলোকিত, পুরো অ্যাকুয়ারিয়ামটিকে একটা অলৌকিত প্রেক্ষাগৃহের মতো মনে হয়।
ক্রানা বুকের মধ্যে আটকে থাকা নিঃশ্বাসটা বের করে দিয়ে বলল, 'আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। কখন শুরু হবে কনসার্ট?'
কিছুক্ষণের মধ্যেই কনসার্টটা শুরু হয়ে গেল। অ্যাকুয়ারিয়ামটা ঘিরে গায়কেরা মাথা ঝাঁকিয়ে গান গাইতে শুরু করে। তাদের শরীরে লাগানো নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র শরীরের তালের সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র সঙ্গীতের ধ্বনি তৈরি করতে শুরু করেছে। বাতাসে মিষ্টি একধরনের গন্ধ, নিশ্চিতভাবেই সেখানে স্নায়ু উত্তেজক একধরনের গ্যাস, যারা উপস্থিত তারা ধীরে ধীরে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সঙ্গীতের তালে তালে তাদের দেহ নড়তে থাকে, মাথা দুলতে থাকে। তারা একজন আরেকজনকে জাপটে ধরে লাফাতে থাকে, চিৎকার করতে থাকে। তারুণ্যের উদ্দাম আনন্দ যেন সব বাধা ভেঙে ফেলবে! এভাবে কতক্ষণ চলেছে কেউ জানে না–হঠাৎ করে সকল সঙ্গীত বন্ধ হয়ে যায়। নগরকেন্দ্রের ভেতর এতটুকু শব্দ নেই।
সবাই অবাক হয়ে দেখল মঞ্চের ঠিক মাঝখানে স্বল্পবসনা একটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সবাইকে মাথা ঝাঁকিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে সে চিৎকার করে বলল, 'এখন তোমাদের সামনে আসছে এ সময়ের সবচেয়ে উত্তেজনাময় মুহূর্ত।'
সবাই আনন্দে চিৎকার করে ওঠে। মেয়েটি দুই হাত তুলে সবাইকে থামার জন্য ইঙ্গিত করে বলল, 'স্টেজে এই বিশাল অ্যাকুয়ারিয়ামে রয়েছে দুটি ক্ষুধার্ত হাঙর। গত এক সপ্তাহ তাদের অভুক্ত রাখা হয়েছে। এই অভুক্ত হাঙরের মতো হিংস্র প্রাণী এখন পৃথিবীতে কিছু নেই। তাদের সামনে এখন কোনো জীবন্ত প্রাণী এলে এক মুহূর্তে তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে এই ক্ষুধার্ত, ক্রুদ্ধ এবং হিংস্র হাঙর মাছ। তোমরা কেউ কি এই দুটি হাঙর মাছের মুখোমুখি হতে চাও?'
নগরকেন্দ্রের শত শত ছেলেমেয়ে চিৎকার করে বলল, 'না!'
'আমি জানি তোমরা এই ক্রুদ্ধ, ক্ষুধার্ত এবং হিংস্র হাঙর মাছের সামনে যেতে চাও না।' মেয়েটি চিৎকার করে বলল, 'কিন্তু এই হিংস্র হাঙর মাছের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে একটি জলজ প্রাণী। বিস্ময়কর এক জলপ্রাণী। দেখতে মানুষের

মতো কিন্তু সেটি মানুষ নয়। এই হাঙর মাছের মতোই হিংস্র এই জলজ প্রাণীতে–দেখতে মানুষের মতো কিন্তু মানুষ নয়। দুটি হাঙর মাছ কতক্ষণে তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে? তোমাদের ভেতরে কার সাহস আছে সেই দৃশ্য দেখার?'
শত শত ছেলেমেয়ে চিৎকার করে বলল, 'আমার! আমার সাহস আছে। আমার।'
'এসো। সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই এই ভয়ঙ্কর খেলায়। দেখো, উপভোগ করো! যাদের স্নায়ু দুর্বল তারা চোখ বন্ধ করে রেখো। তা না হলে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য তোমাদের দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তাড়া করে বেড়াবে! ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে তোমরা জেগে উঠবে প্রতি রাতে। তাই সাবধান!'
বিকট একধরনের যন্ত্রসঙ্গীত বাজতে থাকে, মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে, শুধু বিশাল অ্যাকুরিয়ামে ভয়ঙ্করদর্শন দুটি হাঙর মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। মঞ্চের এক কোনায় একটা স্পটলাইট এসে পড়ল এবং সবাই দেখল সেখানে বিচিত্র একটি মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। মূর্তিটির শরীরটুকু ছোপ ছোপ রঙিন, মুখে ভয়ঙ্করদর্শন একটি মুখোশ, সেই মুখোশে ক্রূর একধরনের দৃষ্টি। মূর্তিটির দুই হাত শেকল দিয়ে বাঁধা, কোমর থেকে ছোট এক টুকরো কাপড় ঝুলছে। এ ছাড়া শরীরে কোনো পোশাক নেই। সুগঠিত পেশিবহুল শরীর।
মূর্তিটি দেখে কাটুস্কা চমকে ওঠে। কয়দিন আগে তার সঙ্গে দেখা হওয়া জলমানবটির কথা মনে পড়ে যায়। তার শরীরও ছিল পেশিবহুল সুগঠিত, সেও ছিল অসম্ভব সুদর্শন। এর মুখটি মুখোশ দিয়ে ঢাকা। এই মুখোশের আড়ালে যে মুখটি লুকিয়ে আছে সেটি কি নিহন নামের সেই তরুণটির? কিন্তু সেটা তো হতে পারে না। তার বাবার সঙ্গে কথা বলে নিহন নামের সেই সুদর্শন জলমানবটিকে সে তার এলাকায় হেলিকপ্টারে পাঠিয়েছিল। এটি নিশ্চয়ই অন্য কোনো প্রাণী। অন্য কোনো জলমানব।
নগরকেন্দ্রের শত শত ছেলেমেয়ে চিৎকার করতে থাকে, 'হত্যা করো। হত্যা করো। হত্যা করো।–'
কাটুস্কা অবাক হয়ে দেখে, মনে হয় নগরকেন্দ্রের সবাই বুঝি পাগল হয়ে গেছে। হাত নেড়ে তারা চিৎকার করছে, 'হত্যা করো। হত্যা করো। হত্যা করো–'
দুই পাশ থেকে দুজন মানুষ এসে মুখোশ পরা মূর্তিটিকে ধরে তার হাতের শেকলটা খুলে দেয়; তারপর তাকে ঠেলে ছোট একটা মইয়ের সামনে নিয়ে যায়। তাকে ধাক্কা দিয়ে মইটা দিয়ে ওপরে তুলে নেয়। নগরকেন্দ্রের শত শত ছেলেমেয়ে হঠাৎ চুপ করে যায়। যে ভয়ঙ্কর দৃশ্যটি তারা দেখতে যাচ্ছে তার জন্য সবার ভেতরে একধরনের উত্তেজনা এসে ভর করেছে। তাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যায়, নিজের অজান্তেই শরীর শক্ত হয়ে আসে।
মূর্তিটি অ্যাকুয়ারিয়ামের ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গীত দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে ওঠে এবং হঠাৎ সেটি থেমে যায়। বিস্ফোরণের মতো একটা শব্দ হলো এবং মূর্তিটির পায়ের নিচে থেকে পাটাতনটি সরে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সেটি পানির ভেতরে পড়ে যায়।
সবাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখতে পেল মূর্তিটি পানির নিচে ঘুরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এক হাত দিয়ে পায়ে বেঁধে রাখা একটা ছোরা হাতে নিয়ে অন্য হাতে নিজের মুখোশটা খুলে ফেলেছে; কাটুস্কা তখন মূর্তিটি চিনতে পারল, সে যা ভেবেছিল তা-ই! মানুষটি নিহন।
কাটুস্কা চিৎকার করে উঠে দাঁড়ায়, 'না। না। না।'
নগরকেন্দ্রে পিনপতন স্তব্ধতা, তার মধ্যে কাটুস্কার চিৎকার শুনে সবাই অবাক হয়ে তার দিকে ঘুরে তাকাল। সবাই দেখল একজন তরুণী উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, 'না, না, না–' তারপর শত শত দর্শকের ভেতর দিয়ে স্টেজের দিক ছুটে যাচ্ছে।
অ্যাকুয়ারিয়ামের ভেতরে নিহন তার কিছু জানে না। সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হাঙর মাছটির দিকে। সে জানে হাঙর মাছ দুটি তার উপস্থিতির কথা টের পেয়েছে, তার শরীর থেকে তৈরি হওয়া অতি সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক সিগন্যালকে লক্ষ করে হাঙর মাছ দুটি ছুটে আসবে। সমুদ্রের সবচেয়ে দ্রুতগামী প্রাণী, এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ নয়।
নিহন সাবধানে পিছিয়ে আসে, অ্যাকুয়ারিয়ামের শক্ত প্লেক্সিগ্লাসের দেয়ালের সঙ্গে নিজের শরীরটা লাগিয়ে সে অপেক্ষা করে। পেছনে প্লেক্সিগ্লাসের দেয়াল, হাঙর মাছ ছুটে এসে তাকে আক্রমণ করতে পারবে না, দেয়ালে ধাক্কা খাওয়ার ঝুঁকি নেবে না হাঙর মাছ। চেষ্টা করবে ওপর থেকে নিচে তাকে টেনে নিতে। অত্যন্ত দ্রুত তাকে সরে যেতে হবে, এক মুহূর্ত সময় পাবে হাঙরের বুকে ধারালো চাকুটা বসিয়ে দেওয়ার, ঠিক জায়গায় বসাতে পারলে মুহূর্তে পুরো তলদেশ দুই ভাগ হয়ে যাবে।
সামনে ভেসে থাকা হাঙর মাছটি আক্রমণ করল। উপস্থিত দর্শকেরা হতবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তীব্র গতিতে একটি হাঙর মাছ ছুটে আসছে–একটা হুটোপুটি এবং হঠাৎ করে একটা রক্তের ধারা। পানিটুকু লাল হয়ে গেছে, সবাই নিশ্চিত হয়ে ছিল যে মূর্তিটির শরীরের একটা অংশ খাবলে নিয়ে গেছে এই হাঙর মাছ। কিন্তু তারা অবাক হয়ে

দেখল, মূর্তিটি অক্ষত হয়ে ভেসে আছে, হাঙর মাছটির বুক থেকে পুরো অংশটুকু দুই ভাগ হয়ে গেছে। ছটফট করতে করতে হাঙর মাছটি নিচে নেমে যাচ্ছে।

উপস্থিত শত শত ছেলেমেয়ের বুকের ভেতর আটকে থাকা নিঃশ্বাসটি বের হয়ে আসে। নিজের অজান্তেই তারা চিৎকার করে ওঠে। একধরনের বিস্ময় নিয়ে তারা তাকিয়ে থাকে। বিশাল অ্যাকুয়ারিয়ামে একজন তরুণ পানির নিচে নিঃশ্বাস না নিয়ে দীর্ঘ সময় ডুবে আছে, সেটি তারা ভুলে যায়। নিজের অজান্তেই তারা ধারণা করে নেয়, এই মূর্তিটি একটি জলজ প্রাণী, পানির নিচে এটি বেঁচে থাকতে পারে।

কাটুস্কা চিৎকার করতে করতে স্টেজের দিকে ছুটে যাচ্ছে, কয়েকজন নিরাপত্তাকর্মী তাকে থামানোর চেষ্টা করে, কিন্তু একটা ঝটকা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে সে স্টেজের দিকে ছুটে যেতে থাকে। সবাই সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে, পানির নিচে ডুবে থাকা বিচিত্র মানুষটি আবার প্লেক্সিগ্লাসের দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে দ্বিতীয় হাঙর মাছটির জন্য অপেক্ষা করছে। একটু আগে যে মূর্তিটির উদ্দেশে সবাই চিৎকার করে বলেছে 'হত্যা করো, হত্যা করো, হত্যা করো–' হঠাৎ করে সবার সহানুভূতি সেই মানুষটির জন্য। সবাই রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে, সবাই অপেক্ষা করছে এই বিস্ময়কর তরুণটি দ্বিতীয় হাঙর মাছটিকেও বুক থেকে নিচে পর্যন্ত চিরে ফেলবে।

হাঙর মাছটি তার লেজ ঝাপটা দিয়ে ঘুরে যায়; তারপর তীব্র গতিতে ছুটে যায়, একটা হুটোপুটি হয়, কে কী করছে বোঝা যায় না। হাঙর মাছটি ঘুরে যায়, যেখানে মানুষটি ছিল সেখানে সে নেই। সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখে, হাঙরের পিঠে সে চেপে বসেছে–হাতের ধারালো চাকু দিয়ে মাছটির মাথায় আঘাত করছে–রক্তের একটা ক্ষীণ ধারা বইছে–ছটফট করতে করতে হাঙর মাছটি অ্যাকুয়ারিয়ামের তলদেশে ডুবে যাচ্ছে।

নিহন এবার হাঙর মাছটিকে ছেড়ে পানির ওপর ভেসে ওঠে। বুক ভরে একবার নিঃশ্বাস নেয়। হলঘরে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে চিৎকার করছে; তার মঝে সে অবাক হয়ে দেখল একজন তরুণী সিঁড়ি বেয়ে অ্যাকুয়ারিয়ামের ওপর উঠে আসছে। নিহন তরুণীটিকে চিনতে পারে। তরুণীটি কাটুস্কা। এই তরুণীটি তাকে মুক্ত করে দিতে চেয়েছিল।

কাটুস্কা তাকে ধরে পানি থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। নিহন অবাক হয়ে দেখে, মেয়েটি হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো চিৎকার করছে, তাকে ঘিরে অনেক নিরাপত্তাকর্মী, তাকে টেনে সরানোর চেষ্টা করছে।

নিহন পানি থেকে বের হয়ে আসে, এক হাতে কাটুস্কাকে জাপটে ধরে নিজের কাছে টেনে আনে। অন্য হাতে ধারালো চাকুটা ধরে রেখে সে শান্ত গলায় বলল, 'সবাই সরে যাও।'

নিরাপত্তাকর্মীরা কাটুস্কাকে ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সরে যায়। চোখের কোনা দিয়ে সবাইকে লক্ষ করতে করতে নিহন কাটুস্কার দিকে তাকাল, নরম গলায় বলল, 'ভালো আছ, কাটুস্কা।'

কাটুস্কা হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। নিহনকে আঁকড়ে ধরে বলে, 'আমি দুঃখিত, নিহন। আমি খুব দুঃখিত।'

'তোমার দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই, কাটুস্কা। আমি জানি কী হয়েছে।'

নিহন দেখতে পায় স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে নিরাপত্তাকর্মীরা তাদের ঘিরে ফেলছে। নিহন শান্ত চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে এক হাতে শক্ত করে কাটুস্কাকে ধরে রেখেছে। থরথর করে কাঁপছে কাটুস্কা। মেয়েটি আকুল হয়ে কাঁদছে। কেন কাঁদছে সে জানে না।

১০.

সমাজ দপ্তরের প্রধান একটু অবাক হয়ে তার যোগাযোগ মডিউলের দিকে তাকিয়ে রইল, কোয়ান্টাম কম্পিউটার তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে! সে একটুখানি অবাক এবং অনেকখানি আতঙ্কিত হয়ে যোগাযোগ মডিউলটা স্পর্শ করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, 'তুমি এটা কী করেছ?'

'কী হয়েছে?'

'নগরকেন্দ্রে জলমানবকে নিয়ে অনুষ্ঠানটির কথা বলছি। এটি নতুন প্রজন্মের উদ্দেশে একটি অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। জলমানবকে একটি অসভ্য বন্য প্রজাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কথা ছিল। হাঙর মাছের হাতে তার মৃত্যুদৃশ্যটি নতুন প্রজন্মের উপভোগ করার কথা ছিল।'

সমাজ দপ্তরের প্রধান একটু অধৈর্য গলায় বললেন, 'আমরা তার ব্যবস্থা করেছিলাম। বিষয়টা নিশ্চিত করার জন্য একটির জায়গায় দুটি হাঙর মাছ দিয়েছিলাম। জলমানবকে দেখে যেন সবার ভেতরে একধরনের ঘৃণা হয় সে জন্য তাকে কুৎসিত একটা মুখোশ পরিয়েছিলাম। আমরা বুঝতে পারিনি সে নিজের মুখোশ খুলে ফেলবে। বুঝতে পারিনি দুই-দুইটা হাঙর মাছ তাকে হত্যা করতে পারবে না।'

কোয়ান্টাম কম্পিউটার ভাবলেশহীন গলায় বলল, 'জলমানবের হাতে একটা ধারালো চাকু দেওয়ার সিদ্ধান্তটি একটি

ভুল সিদ্ধান্ত ছিল।'

'একেবারে খালি হাতে দুটি ক্ষুধার্ত হাঙর মাছের মাঝখানে ফেলে দেওয়া অমানবিক বলে মনে হয়েছিল। বিষয়টা আরো নাটকীয় করার জন্য তাকে ছোট একটা চাকু দেওয়া হয়েছিল। আমরা বিষয়টি তোমার সঙ্গে আলোচনা করে নিয়েছিলাম, তুমি অনুমতি দিয়েছিলে।'

'হ্যাঁ। তখন অনুমতি দিয়েছিলাম, কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সিদ্ধান্তটা সঠিক ছিল না।'

সমাজ দপ্তরের প্রধান চমকে উঠে বললেন, 'তুমি এর আগে কখনো ভুল সিদ্ধান্ত নাওনি। এই প্রথম তুমি একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছ, কোয়ান্টাম কম্পিউটার।

কোয়ান্টাম কম্পিউটার দীর্ঘসময় চুপ করে থেকে বলল, 'ভুলগুলো সংশোধনের সময় এসেছে। কথা ছিল এই ঘটনা দেখে জলমানবের জন্য একধরনের ঘৃণার জন্ম নেবে। হাঙর মাছের হাতে তার একধরনের নিষ্ঠুর মৃত্যু হলে সকল দর্শকের মধ্যে জলমানবের জন্য ঘৃণা জন্ম নিত। উল্টো জলমানবটি সবার সামনে একজন নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সবার সমবেদনা এবং ভালোবাসা ছিল এই জলমানবের জন্য। এটি খুব বড় ভুল হয়েছে।'

'আমাদের কিছু করার ছিল না।'

কোয়ান্টাম কম্পিউটার বলল, 'কাটুস্কা নামের মেয়েটি পুরো বিষয়টাকে অনেক জটিল করে দিয়েছে। তাকে কিছুতেই মঞ্চে আসতে দেওয়া উচিত হয়নি। কিছুতেই জলমানবের কাছে পৌঁছাতে দেওয়া উচিত হয়নি।'

'নিরাপত্তাকর্মীরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে বাধা উপেক্ষা করে মঞ্চে উঠে গেছে।'

কোয়ান্টাম কম্পিউটার শুষ্ক গলায় বলল, 'পুরো বিষয়টাকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার একটি মাত্র উপায়।'

'কী উপায়?'

'জলমানবকে দিয়ে কাটুস্কাকে খুন করানো।'

সমাজ দপ্তরের প্রধান চমকে উঠে বললেন, 'কাটুস্কা প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান রিওনের মেয়ে। রিওন তার মেয়েকে অসম্ভব ভালোবাসেন।'

'তাতে কিছু আসে যায় না। আমি ভালোবাসা বুঝি না। আমি তোমাদের ভবিষ্যৎ বুঝি। আমার ওপর দায়িত্ব তোমাদের সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তা ছাড়া–'

'তা ছাড়া কী?'

'প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধানের মধ্যে আমি একধরনের দুর্বলতা লক্ষ করছি। এই দুর্বলতা থাকলে সে প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান হতে পারবে না। তাকে আরও শক্ত হতে হবে। সে এই ঘটনায় শক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে।'

সমাজ দপ্তরের প্রধান চুপ করে রইলেন, হঠাৎ করে তিনি অসহায় বোধ করতে থাকেন। ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা কেমন করে জলমানবকে দিয়ে কাটুস্কাকে খুন করাব? জলমানব কাটুস্কাকে নিরাপত্তাকর্মীদের হাত থেকে রক্ষা করেছে।'

'তোমরা সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। জলমানবের বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর। অধিক কম্পনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেজোনেন্স তৈরি করে দিতে পারলেই সে খুনে হয়ে যাবে। তখন সামনে যাকেই পাবে তাকেই খুন করবে।'

'ও।' সমাজ দপ্তরের প্রধান মৃদুস্বরে বললেন, 'ঠিক আছে।'

'তুমি শুধু কাটুস্কা আর জলমানবকে একঘরে বন্ধ করো। ঘরটির যেন ধাতব দেয়াল হয়।'

'ঠিক আছে।'

কোয়ান্টাম কম্পিউটার বলল, 'আর শোনো।'

'কী?'

'তোমার সঙ্গে আমার এই কথোপকথনটি কারো জানার প্রয়োজন নেই।'

'কিন্তু–'

'এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই।'

সমাজ দপ্তরের প্রধান একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলেন।

ছোট একটা ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা গোল টেবিল এবং সেই টেবিলের দুই পাশে দুটি চেয়ার। টেবিলে কিছু শুকনো খাবার এবং একটা পানীয়ের বোতল। একটি চেয়ারে কাটুস্কা বসে আছে। নিহন ঘরের মোটামুটি ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। কাটুস্কা ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না এখানে কী

হচ্ছে?'
নিহন জিজ্ঞেস করল, 'কেন, কী হয়েছে?'
'আমি প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধানের মেয়ে। আমাকে এভাবে ছোট একটা ঘরে আটকে রাখার কথা না। আমাকে নেওয়ার জন্য এখন প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে বড় বড় মানুষের চলে আসার কথা।'
নিহন কোনো কথা বলল না। কাটুস্কা বলল, 'আমি তোমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য হেলিকপ্টার আনিয়েছিলাম, কিন্তু হেলিকপ্টার তোমাকে ছেড়ে দেয়নি, এখানে নিয়ে এসেছে–আমি সেটাও বুঝতে পারছি না।'
নিহন এবারও কোনো কথা বলল না। কাটুস্কা পকেট থেকে তার যোগাযোগ মডিউলটা বের করে বলল, 'আর কী আশ্চর্য, দেখো আমার যোগাযোগ মডিউলটা দিয়ে আমি আমার বাবার সঙ্গে কিছুতেই যোগাযোগ করতে পারছি না।'
নিহন কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'তোমাদের সমাজটা অন্য রকম।'
'কী রকম?'
আমার ধারণা ছিল তোমরা হয়তো স্বার্থপরের মতো আমাদের সমুদ্রের পানিতে ঠেলে দিয়েছ, কিন্তু নিজেদের সর্বনাশ করবে না।'
'আমরা নিজেদের সর্বনাশ করছি?'
'হ্যাঁ।'
'এ কথা কেন বলছ?'
'তোমার বয়সী একটা মেয়ে টিকিট কিনে হাঙর মাছ দিয়ে একটা মানুষকে খেয়ে ফেলার দৃশ্য দেখতে আসে?'
কাটুস্কা কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। নিহন জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো? থেমে গেলে কেন? বলো।'
'না, বলব না। বলে লাভ নেই। আমাদের যুক্তিগুলো তুমি বুঝবে না।'
নিহন মাথা নাড়ল, বলল, 'আমি বুঝতে চাই না। আমাদের অনেক কষ্ট, কিন্তু তোমাদের এই জীবনের জন্য আমি আমার কষ্ট ছেড়ে আসব না।'
কাটুস্কা স্থির দৃষ্টিতে নিহনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেন? এ কথা কেন বলছ?'
'আমাকে হাজার হাজার যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করেছে। কত চমৎকার যন্ত্রপাতি, যেটা আমরা জীবনে দেখিনি, শুধু ছবি দেখেছি। কিন্তু অবাক ব্যাপার কী জানো?'
'কী?'
'তোমাদের কোনো মানুষ সেই যন্ত্রপাতি কীভাবে কাজ করে সেটা জানে না। তোমাদের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে কোয়ান্টাম কম্পিউটার! সে তোমাদের আদেশ দেয় তোমরা তার আদেশে উঠ, তার আদেশে বস।'
কাটুস্কা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, 'শ-স-স-স-।'
নিহন অবাক হয়ে বলল, 'কী হয়েছে?'
'কোয়ান্টাম কম্পিউটার নিয়ে এখানে কোনো কথা বলে না।'
নিহন অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'
'মানুষের বুদ্ধিমত্তা মস্তিষ্কের ভেতরে যেরকম থাকতে পারে, বাইরেও থাকতে পারে। কোয়ান্টাম কম্পিউটার সেরকম আমাদের সবার বুদ্ধিমত্তা। আমাদের অস্তিত্ব–'
হঠাৎ করে ঘরের ভেতর একটা ভোতা শব্দ হলো, তার সঙ্গে একধরনের সূক্ষ্ম কম্পন। নিহন অবাক হয়ে বলল, 'কিসের শব্দ?'
কাটুস্কা ওপরের দিকে তাকাল; তারপর ফিসফিস করে বলল, 'ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেজোনেন্স।'
'কী হয় এই রোজেনেন্স দিয়ে?'
'মস্তিস্কে স্টিমুলেশন দেওয়া হয়। অনুভূতির পরিবর্তন করা হয়।'
নিহন অবাক হয়ে বলল, 'আমাদের অনুভূতি পাল্টে দেবে?'
কাটুস্কা ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, 'হ্যাঁ। মনে হয় আমাদের অনুভূতি পাল্টে দেবে।'
নিহন হঠাৎ নিজের ভেতরে গভীর একধরনের বিষাদ অনুভব করে। হঠাৎ করে মনে হতে থাকে এই জীবন অর্থহীন। বুকের ভেতর সে একধরনের হাহাকার অনুভব করে। ঘরের ভেতর ভোঁতা শব্দটি হঠাৎ একটু তীক্ষ্ণ হয়ে যায়। নিহন তার মস্তিষ্কের ভেতর একধরনের যন্ত্রণা অনুভব করে, ভোঁতা যন্ত্রণায় মাথার ভেতর দপদপ করতে থাকে এবং যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভেতর একধরনের ক্রোধ দানা বাঁধতে থাকে। নিহন ফিসফিস করে নিজেকে বলল, 'আমাকে ওরা রাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমার কিছুতেই রেগে ওঠা চলবে না। কিছুতেই না।'

তারপরও সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। কাটুস্কার দিকে তাকিয়ে থেকে তার ভেতর ভয়ঙ্কর একধরনের ক্রোধ বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়ে। 'এই মেয়েটি আমাকে খুন করার চেষ্টা করছিল।' নিহন দাঁতে দাঁত ঘষে নিজেকে বলে, 'এই মেয়েটি আমাকে ধরিয়ে এনেছে। এই মেয়েটির জন্য আমাকে হাঙর মাছের মুখে ছেড়ে দিয়েছিল। এই হতভাগিনী মেয়েটিকে খুন করে ফেলা উচিত। ধারালো চাকু দিয়ে ফালা ফালা করে ফেলা উচিত।'

নিহন অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে একধরনের অমানবিক ক্রোধ তার ভেতর পাক খেয়ে উঠছে। নিজের অজান্তেই সে তার পায়ে বেঁধে রাখা চাকুটা হাতে তুলে নেয়। ধারালো চাকুটা দিয়ে কাটুস্কাকে ফালা ফালা করার একধরনের অমানবিক ইচ্ছা তাকে অস্থির করে তুলে।

'তুমি!' কাটুস্কার চিৎকার শুনে নিহন তার চোখের দিকে তাকাল।

কাটুস্কা হাত তুলে নিহনের দিকে দেখিয়ে চিৎকার করে বলে, তুমি এই সর্বনাশের শুরু করেছ। তোমার জন্য আজ আমার এই অবস্থা! তোমাকে আমি খুন করে ফেলব!'

নিহন পরিষ্কারভাবে কিছু চিন্তা করতে পারছিল না। ভয়ঙ্কর ক্রোধের ভেতর সে আবছাভাবে বুঝতে পারে ঠিক তার মতোই এই মেয়েটির মাথায় ভয়ঙ্কর ক্রোধ এসে ভর করেছে। ঠিক তার মতোই এই ক্রোধ পুরোপুরি অযৌক্তিকভাবে তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে।

কাটুস্কা চিৎকার করে বলল, 'তুমি একটি হিংস্র জলমানব। তুমি কেন এসেছ আমাদের কাছে? কেন? যাও। তুমি যাও। তুমি চলে যাও এখান থেকে। তুমি জাহান্নামে যাও। আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাও।'

নিহন অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে, বিড়বিড় করে বলে, 'আমাকে একটু ধৈর্য দাও। একটু শক্তি দাও। এই হতভাগিনী মেয়েটাকে আমি খুন করে ফেলব–কিন্তু তবুও একটু সহ্য করতে দাও।'

বাইরের তীক্ষ্ণ শব্দটির কম্পন হঠাৎ আরো বেড়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে কাটুস্কা হিংস্র মুখে নিহনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার নখ দিয়ে মুখ খামচে ধরে চিৎকার করে বলে, 'তোমার ওই নোংরা চোখ দুটো আমি খুবলে তুলে ফেলব। খামচি দিয়ে মুখের চামড়া তুলে ফেলব–'

নিহন আর কিছু চিন্তা করতে পারছিল না। তার সমস্ত চেতনা অবলুপ্ত হয়ে সেখানে ভয়ঙ্কর অন্ধ একধরনের ক্রোধ এসে ভর করেছে। নিজের অজান্তে ধারালো চাকুটা হাতে নিয়ে সে খুব ধীরে ধীরে তার হাত ওপরে তুলেছে। ঠিক তখন কাটুস্কা আবার তাকে আঘাত করল। নিহন প্রস্তুত ছিল না, তাল সামলাতে না পেরে সে পড়ে যায়। হাত দিয়ে নিজেকে কোনোভাবে সামলে নিয়ে নিহন আবার উঠে দাঁড়াতে গিয়ে থেমে গেল। তার ভেতরকার অন্ধ ক্রোধটি নেই, তার বদলে সেখানে একধরনের বিস্ময়! নিহন কাটুস্কার দিকে তাকাল, কাটুস্কার সমস্ত মুখ ভয়ঙ্কর ক্রোধে বিকৃত হয়ে আছে। একটি চেয়ার তুলে এনে সেটা দিয়ে নিহনকে আঘাত করার চেষ্টা করল। নিহন ঘরটার দিকে তাকাল, এটা একটা রেজোনেন্ট কেভিটি। ঘরের মেঝেতে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড নেই, ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে ঘরের মাঝখানে সেটা সর্বোচ্চ। সে মেঝেতে শুয়ে আছে বলে তার মস্তিষ্কে কোনো স্টিমুলেশন নেই, তাই অন্ধ ক্রোধটি নেই। কাটুস্কা দাঁড়িয়ে আছে, তীব্র ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড তার মস্তিষ্ককে দলিত-মথিত করে ফেলছে, তাকে রাগে অন্ধ করে ফেলছে! কাটুস্কাকেও শুইয়ে ফেলতে হবে।

নিহন গড়িয়ে কাটুস্কার কাছে এগিয়ে যায়, কিছু বোঝার আগে তার পা দুটি জাপটে ধরে নিচে ফেলে দেয়–'ছাড়ো আমাকে, ছাড়ো, ছেড়ে দাও' বলে চিৎকার করতে করতে কাটুস্কা হঠাৎ থেমে যায়। নিহন তাকে মেঝেতে চেপে ধরে রেখে ফিসফিস করে বলে, 'শান্ত হও। শান্ত হও, কাটুস্কা।'

কাটুস্কা বড় বড় কয়েকটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'কী হলো? হঠাৎ করে আমার রাগটা কমে গেল কেন?'

'শুয়ে থাকো, তাহলেই হবে।'

'কেন?'

'এই ঘরটা আসলে একটা রেজোনেন্ট কেভিটি। ভেতরে স্ট্যান্ডিং ওয়েভ তৈরি করছে। প্রচণ্ড শক্তিশালী স্ট্যান্ডিং ওয়েভ। ঘরের মাঝখানে সবচেয়ে বেশি, মেঝেতে কমতে কমতে শূন্য হয়ে গেছে। তাই শুয়ে থাকলে তোমার মস্তিষ্কে স্টিমুলেশন দিতে পারবে না।'

কাটুস্কা অবাক হয়ে বলল, 'তুমি কেমন করে জানো?'

'পড়েছি।'

'তোমাদের এসব পড়তে হয়?'

হ্যাঁ। আমাদের কোয়ান্টাম কম্পিউটার নেই, তাই অন্য কিছু আমাদের জন্য চিন্তা করে না। নিজেদের চিন্তা নিজেদের করতে হয়!'

'কী আশ্চর্য!'

নিহন মাথা নাড়ল, বলল, 'এর মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই। তোমরা যেটা করো, সেটা হচ্ছে আশ্চর্য।'

কাটুস্কা মেঝেতে মাথা লাগিয়ে শুয়ে থেকে বড় বড় কয়েকটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, 'আমি খুব দুঃখিত, নিহন। খুব দুঃখিত।'

'কেন?'

'খামচি দিয়ে তোমার চোখ দুটো খুবলে তোলার চেষ্টা করেছিলাম বলে।'

নিহন হেসে ফেলল, এই প্রথম সে হেসেছে এবং তার মুক্তার মতো ঝকঝকে দাঁত দেখে কাটুস্কা অবাক হয়ে যায়, একটা মানুষ কেমন করে এত সুদর্শন হতে পারে সে ভেবে পায় না। কাটুস্কা নিচু গলায় বলল, 'এটা হাসির ব্যাপার না–তুমি হাসছ কেন?'

'আমি হাসছি কারণ আর একটু হলে আমি আমার চাকুটা দিয়ে তোমাকে ফালা ফালা করে দিতাম। তুমি আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে খুব বড় উপকার করেছ।'

'এখন আমরা কী করব? সারাক্ষণ তো শুয়ে থাকতে পারব না।'

'চলো, বের হই।'

কাটুস্কা বলল, 'বাইরে থেকে ঘরে তালা মারা।'

'এটা নম্বর তালা। ভেতর থেকে নম্বরটি দেওয়া হলে তালাটি খুলে যাবে না?'

'হ্যাঁ। খুলে যাবে। কিন্তু নম্বরটি তো তুমি জানো না।'

নিহন গড়িয়ে গড়িয়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। বাইরে থেকে ঘরটি তালা মেরে রেখেছে। নিহন অনুমানে ভর করে একটা সংখ্যা ঢোকাতেই তালাটা খুট করে খুলে গেল। কাটুস্কা অবাক হয়ে বলল, 'তুমি কেমন করে খুললে?'

'জানি না। আন্দাজে।'

'কীভাবে আন্দাজ করলে?'

'যেহেতু এগুলো সব তোমাদের কোয়ান্টাম কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করে তাই সংখ্যাটা নিশ্চয়ই সাধারণ সংখ্যা হবে না। নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো সংখ্যা হবে। তাই চার অঙ্কের বিশেষ একটা সংখ্যা দিয়ে চেষ্টা করেছি। প্রথম চেষ্টাতেই মিলে গেছে। তোমাদের কোয়ান্টাম কম্পিউটার আসলে খুব সাদাসিধে টাইপের।'

'কী আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য হবার অনেক সময় পাবে। এখন চলো বের হয়ে যাই।'

'চলো।'

দরজা খুলে দুজন বের হয়ে যায়। দূরে কোথাও অ্যালার্ম বাজতে থাকে। তার মধ্যে দুজন ছুটতে ছুটতে বের হয়ে যায়।

১১.

প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান রিওন সমাজ দপ্তরের প্রধানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার মেয়ে কাটুস্কা কোথায়?'

সমাজ দপ্তরের প্রধান ইতস্তত করে বললেন, 'আমি জানি না।'

'আমার কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে যে তোমার লোকজন আমার মেয়ে আর জলমানব ছেলেটিকে ধরে এনেছে।'

'হ্যাঁ। ধরে এনেছিল। কিন্তু তারা এখান থেকে পালিয়ে গেছে।'

রিওন ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, 'কেন তাদের ধরে এনেছিলে, তোমাকে কে সেই ক্ষমতা দিয়েছে?'

সমাজ দপ্তরের প্রধান ইতস্তত করে বললেন, 'আমি এটা নিয়ে কথা বলতে চাই না, কিন্তু তুমি জেনে রাখো আমার কোনো উপায় ছিল না।'

রিওন কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে সমাজ দপ্তরের প্রধানের দিকে তাকিয়ে রইলেন; তারপর বললেন, 'এখন তারা কোথায়?'

'আমি জানি না। এখান থেকে বের হয়ে একটা দ্রুতগামী ক্যাব ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে।'

'কোথায় গেছে?'

'আমি জানি না।'

রিওন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন, তিনি ইচ্ছে করলে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের তথ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন, কিন্তু তার ইচ্ছে করল না। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি তার ঘরের দিকে ফিরে চললেন। ঠিক কী কারণ জানা নেই, তার মনে হতে থাকে কাটুস্কা যেখানেই আছে নিরাপদে আছে।

সমুদ্রের ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ছিল। আকাশে একটা অসম্পূর্ণ চাঁদ, তার মৃদু আলোতে পুরো বালুবেলাটিতে একধরনের নরম আলো। নিহন ছোট নৌকাটি পরীক্ষা করে বলল, 'চমৎকার!'
কাটুস্কা ইতস্তত করে বলল, 'তুমি সত্যি-সত্যি এই নৌকা দিয়ে পাড়ি দেবে? এটা একটা খেলনা নৌকার মতো।'
'খেলনা নৌকার মতো হলেও এটা সত্যি নৌকা। আমার জন্য যথেষ্ট।'
'এই ছোট নৌকা করে তুমি একা একা কয়েক হাজার কিলোমিটার যাবে?'
'হ্যাঁ।'
'কীভাবে যাবে?'
'তোমার কাছে এই শুকনো মাটিটুকু যেরকম আমার কাছে সমুদ্রের পানি সেরকম! এই সমুদ্রের পানি আমার নিজের এলাকা। আমি এখানে দিনের পর দিন থাকতে পারি।'
'কোনদিকে যেতে হবে তুমি কেমন করে বুঝবে?'
'বছরের এই সময় একটা বড় স্রোত তৈরি হয়। সেই স্রোতে নৌকাটাকে নিয়ে যাবে!'
'তুমি খাবে কী?'
'সমুদ্রে কি খাবারের অভাব আছে? কত মাছ। কত রকম সামুদ্রিক লতাপাতা। সমুদ্রে কেউ না খেয়ে থাকে না।'
'পানি? পানি কোথায় পাবে?'
'ঠিকভাবে খেলে আলাদা করে পানি খেতে হয় না। তা ছাড়া সমুদ্রের পানি থেকে যে জলীয় বাষ্প বের হয়, আমরা সেটা সংগ্রহ করতে পারি–'
'কিন্তু–'
নিহত হাসার ভঙ্গি করে বলল, 'এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই। আজ হোক কাল হোক আমার সঙ্গে কোনো একটা ডলফিনের ঝাঁকের সঙ্গে দেখা হবে। আমি তাদের দিয়ে খবর পাঠাব–ঠিক ঠিক খবর পৌঁছে যাবে আমার এলাকায়। আমার পোষা ডলফিন চলে আসবে তখন।'
কাটুস্কা অবাক হয়ে বলল, 'কী আশ্চর্য! তোমরা সত্যিই ডলফিনের সঙ্গে কথা বলতে পার!'
'হ্যাঁ, পারি। কাজেই তুমি আমার জন্য কোনো চিন্তা করো না। আমি পৌঁছে যাব। শুধু একটা ব্যাপার–'
'কী ব্যাপার?'
'এই যে নৌকাটা আমি নিয়ে যাচ্ছি, এটা কার নৌকা আমি জানি না।'
'তুমি সেটা নিয়ে চিন্তা করো না, আমি নৌকার মালিককে খুঁজে বের করে তাকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেব।'
নিহন আকাশের দিকে তাকাল; তারপর সমুদ্রের পানির দিকে তাকাল, কান পেতে কিছু একটা শুনল; তারপর ঘুরে কাটুস্কার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় রওনা দিয়ে দেওয়া উচিত। বাতাসের শব্দ শুনছ? এই বাতাসে পাল তুলে দিলে আমি দেখতে দেখতে সমুদ্রের স্রোতে পৌঁছে যাব।'
কাটুস্কা কিছু বলল না। নিহন বলল, 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তুমি আমাকে সাহায্য না করলে আমি কোনোদিন এখান থেকে যেতে পারতাম না।'
কাটুস্কা এবারও কোনো কথা বলল না। নিহন বলল, 'এখন অনেক রাত। তুমি ফিরে যাও, কাটুস্কা। তোমাকে নিশ্চয়ই খুঁজছে।'
'হ্যাঁ। যাই।' কাটুস্কা খুব সাবধানে নিহনের মুখমণ্ডল স্পর্শ করে বলল, 'তুমিও যাও। খুব সাবধানে যেও।'
'যাব।'
'আমার কথা মনে রেখো।'
'মনে রাখব, কাটুস্কা।'
'আমরা তোমাদের পানিতে ঠেলে দিয়ে খুব অন্যায় করেছিলাম। অথচ–'
'অথচ কী?'
'অথচ তোমরাই ভালো আছ। আমরা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছি।'
'এ রকম কথা কেন বলছ?'
কাটুস্কা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'আমার খুব কাছের বন্ধুরা আত্মহত্যা করেছে। যারা করেনি তাদের অনেকে নেশায় ডুবে থাকে। বাকি যারা আছে তারা ভান করে খুব ভালো আছে, আসলে ভালো নেই। তারা মাঝেমধ্যে মনে করে আত্মহত্যাই বুঝি ভালো ছিল!'

'কী বলছ তুমি?'
কাটুস্কা বলল, 'হ্যাঁ, সত্যি বলছি। আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আমাদের দেখার মতো কোনো স্বপ্ন নেই। আমরা কেন বেঁচে আছি জানি না। নিহন, তোমাকে দেখে আমার যে কী হিংসা হচ্ছে তুমি জানো?'
'কেন, কাটুস্কা?'
'চাঁদের আলোতে উত্তাল সমুদ্রে তুমি এই ছোট নৌকায় পাল উড়িয়ে যাবে। সমুদ্রের মাছ লতাপাতা তোমার খাবার–সমুদ্রের পানি তোমার আশ্রয়। ডলফিনেরা এসে তোমার সঙ্গে কথা বলবে–যখন তোমার এলাকায় পৌঁছাবে সেখানে তোমার আপনজনেরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে! কোনো একটা রূপবতী মেয়ে ছুটে এসে তোমার বুকে মাথা গুঁজে ভেউ ভেউ করে কাঁদবে–আমি কী নিয়ে থাকব?'
নিহন কোনো কথা বলল না। কাটুস্কা ফিসফিস করে বলল, 'আমার কী ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে যেতে! ইশ! আমি যদি তোমার মতো জলমানব হয়ে যেতে পারতাম!'
কাটুস্কা জলমানব হতে পারল না। সে সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে রইল–সমুদ্রের ঢেউ তার পা ভিজিয়ে দিচ্ছিল। বাতাসে হাহাকারের মতো একধরনের শব্দ, মনে হয় কেউ বুঝি করুণ সুরে কাঁদছে।
চাঁদের আলোতে দেখা যাচ্ছে ছোট একটা নৌকা পাল উড়িয়ে যাচ্ছে। সেই নৌকায় অসম্ভব রূপবান একজন জলমানব ধীরে ধীরে সমুদ্রের গভীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে। সে কি চিৎকার করে ডাকবে এই রূপবান তরুণটিকে, কাতর গলায় অনুনয় করে বলবে 'তুমি আমাকে নিয়ে যাও! আমাকে নিয়ে যাও তোমার সঙ্গে?'
কাটুস্কা ডাকল না, ডাকলেও সমুদ্রের উথাল-পাথাল বাতাসে সেই ডাকটি কেউ শুনতে পেত না।

১২.

সমুদ্রের নীল পানিতে ছোট একটা নৌকা ভেসে যাচ্ছে। চারপাশে অথই জলরাশি তার কোনো শুরু নেই শেষ নেই। নৌকার হাল ধরে নিহন মৃদু সুরে গান গায়, বিরহিনী একটা মেয়ের গান। মেয়েটি ঘরের দরজায় মাথা হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রিয়তম নৌকা নিয়ে সমুদ্রে গিয়েছে কখন ফিরে আসবে সে জানে না। আকাশ কালো করে মেঘ আসছে, সমুদ্রের নীল জল ধূসর হয়ে ফুঁসে উঠছে, কিন্তু দিগন্তে এখনো তো নৌকার মাস্তুল ভেসে উঠছে না। মেয়েটির বুকে অশুভ আশঙ্কার ছায়া। বিরহিনী মেয়েটি দরজায় মাথা রেখে ভাবছে তার প্রিয়তম ফিরে আসতে পারবে কি? নিহন গুনগুন করে বিরহিনী মেয়েটার গান গায়, কোথায় শিখেছে এই গানের কলি? শিখেছে কি কখনো?
অন্ধকার নেমে এলে আকাশের নক্ষত্রেরা পরম নির্ভরতায় তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার চেনা নক্ষত্রগুলো পুব আকাশে উঠে সারা রাত তাকে চোখে চোখে রেখে সূর্য ওঠার আগে অদৃশ্য হয়ে যায়।
নিহন নৌকার হাল ধরে বসে থাকে। আন্তঃমহাসাগরীয় স্রোত তাকে ভাসিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কত দিন সে ভাসবে এভাবে?

১৩.

দরজায় শব্দ শুনে কায়ীরা চোখ মেলে তাকাল। এত রাতে কে এসেছে?
কায়ীরা ঝুলিয়ে রাখা চাদরটা নিজের গায়ে জড়িয়ে দরজা খুলে বাইরে এল। অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো কে যেন দাঁড়িয়ে আছে; কায়ীরা অবাক হয়ে বলল, 'কে?'
'আমি। আমি নিহন।'
'নিহন!' কায়ীরা কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারে না। সে জ্যোৎস্নার ম্লান আলোতে নিহনকে দেখার চেষ্টা করল, বলল, 'তুমি কখন এসেছ, নিহন।'
'এই তো। এখন।'
'তুমি কেমন ছিলে, নিহন?' তোমাকে নিয়ে আমি খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তোমাকে ফিরে পাব আমরা সেটা ভাবিনি, নিহন।'
চাঁদের ম্লান আলোতে নিহন মৃদু হাসল, বলল, 'আমিও ভাবিনি আমি ফিরে আসব।'
'তুমি কেমন করে ফিরে এসেছ?'
'ছোটো একটা নৌকায়। আন্তঃমহাসাগরীয় স্রোতে ভেসে ভেসে।'
'নৌকা কেমন করে পেলে?'
'আমাকে একজন দিয়েছে। একটি মেয়ে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, কায়ীরা, সত্যি। সে আমাকে বলেছে আমার মতন সেও জলমানব হয়ে যেতে চায়।'

কায়ীরা কোনো কথা বলল না, একটু অবাক হয়ে নিহনের দিকে তাকিয়ে রইল। নিহন ফিসফিস করে বলল, 'তোমার মনে আছে, কায়ীরা, অনেক দিন আগে তুমি আমাকে বলেছিলে আমরা আমাদের নিজেদের জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে টিকে আছি। সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানটুকু কী আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে বলনি।

'হ্যাঁ, মনে আছে।'

'তুমি আমাকে বলেছিলে আমার নিজের সেটা খুঁজে বের করতে হবে। আমি সেটা বের করেছি, কায়ীরা।'

'বের করেছ? সেটা কী?'

'জীবনের কাছাকাছি জ্ঞান হচ্ছে সত্যিকারের জ্ঞান। যদি সেটা না থাকে তাহলে যত চমকপ্রদ জ্ঞানই হাতে তুলে দেওয়া হোক সেটা ধরে রাখা যায় না।'

কায়ীরা একটু হাসল, বলল, 'তুমি এইটুকুন ছেলে কত বড় মানুষের মতো কথা বলছ।'

'আমি এটা আমার জীবন থেকে শিখেছি, কায়ীরা।'

'আমি জানি।'

'আমরা যে ডলফিনের সঙ্গে কথা বলি, এই জ্ঞানটুকু স্থলমানবদের মাহাকাশযান তৈরি করার জ্ঞান থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

কায়ীরা মাথা নাড়ল। নিহন বলল, 'সামুদ্রিক শ্যাওলা দিয়ে কীভাবে কাপড় বানাতে হয় সেই জ্ঞান কোয়ান্টাম কম্পিউটার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সামুদ্রিক শঙ্খ দিয়ে কীভাবে মস্তিষ্ক প্রদাহের ওষুধ তৈরি করতে হয় সেই জ্ঞান তাদের নিউক্লিয়ার শক্তির জ্ঞান থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যেভাবে–'

কায়ীরা নিহনের কাঁধ ধরে বলল, 'নিহন, আমি বুঝতে পারছি, নিহন। আমি বুঝতে পারছি তুমি কী বলতে চাইছ।'

কায়ীরা নিহনকে গভীর মমতায় আলিঙ্গন করে ফিসফিস করে বলল, 'নিহন, তুমি এখন তোমার মায়ের কাছে যাও। কত দিন থেকে তোমার মা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'হ্যাঁ, যাই।'

কায়ীরা নিহনকে ছেড়ে দিল, নিহন জ্যোৎস্নার আবছা আলোতে হেঁটে হেঁটে ফিরে যেতে থাকে।

নিহনকে স্থলমানবেরা ধরে নিয়েছিল গ্রীষ্মের শুরুতে। এখন গ্রীষ্মের শেষ। আকাশে শরতের মেঘ উঁকি দিতে শুরু করেছে। বাতাসে হঠাৎ হঠাৎ হিমেল বাতাসের স্পর্শ পাওয়া যায়। নিহন আবার তার আগের জীবনে ফিরে গেছে; প্রিয় ডলফিন শুশুকে নিয়ে সমুদ্রের পানিতে ছুটে বেড়ায়, সমুদ্রের গভীরে গিয়ে সেখানকার বিচিত্র জীবন গভীর কৌতূহল নিয়ে দেখে। নীল তিমিকে পোষ মানানোর একটা পরিকল্পনা অনেক দিন থেকে সবার মাথায় কাজ করছিল, সেটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। তবে তার ভেতরে একটা বড় পরিবর্তন হয়েছে লেখাপড়ার ব্যাপারে। গভীর মনোযোগ দিয়ে সে লেখাপড়া করে। নিজে যেটুকু জানে ছোটদের সেটা সে শেখায় অনেক আগ্রহ নিয়ে। সে বুঝে গেছে তাদের বেঁচে থাকার এই একটিই উপায়। যেটুকু জ্ঞান আছে সেটা ধরে রাখতে হবে, আর নতুন জ্ঞানের জন্ম দিতে হবে। তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান।

মাঝখানে কয়দিন আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল, হঠাৎ করে মেঘ কেটে আকাশে সূর্য উঠেছে। নিহন ছোট ছোট কিছু ছেলেমেয়েকে নিয়ে সমুদ্রের পানিতে খেলছে, পোষা ডলফিনে উঠে সমুদ্রের নিচে চলে যাওয়ার খেলা। খেলা যখন খুব জমে উঠেছে, তখন হঠাৎ করে তার পোষা ডলফিন শুশু তার কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। নিহন আদর করে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কী খবর, শুশু?'

শুশু তার ভাষায় উত্তর দিল, 'নৌকা।'

'কার নৌকা?'

'জানি না। অনেক অনেক দূর।'

নিহনের ভুরু কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, কোথা থেকে নৌকা আসছে? কেন আসছে?

'কতগুলো নৌকা?'

'একটা।'

'কত বড় নৌকা?'

'ছোট।'

নিহন ছেলেমেয়েগুলোকে নাইনার হাতে ধরিয়ে দিয়ে শুশুর পিঠে চেপে বসে। পেটে থাবা দিয়ে বলে, 'চল যাই।'

শুশু মাথা নেড়ে বলল, 'ভয়।'
'কোনো ভয় নেই। শুধু দূর থেকে দেখব। চল।'
শুশু নিহনকে পিঠে নিয়ে সমুদ্রের পানি কেটে ছুটে যেতে থাকে।
নৌকাটার কাছে যখন পৌঁছেছে, তখন বেলা পড়ে এসেছে। অনেক দূর দিয়ে নিহন নৌকাটাকে ঘুরে দেখল। সাদাসিধে একটা নৌকা, এটা তাদের কারো নৌকা নয়। দেখে মনে হয় স্থলমানবদের এলাকা থেকে এসেছে। ভেতরে কেউ আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। নিহন সাবধানে আরেকটু এগিয়ে গেল। শুশুর পিঠে চড়ে লাফ দিয়ে ওপরে উঠে সে ভেতরে দেখার চেষ্টা করে। নৌকার ঠিক মাঝখানে লম্বা হয়ে কেউ একজন শুয়ে আছে।
নিহন এবার শুশুকে ছেড়ে নৌকার কাছে এগিয়ে যায়। সাবধানে নৌকাটাকে ধরে তার ওপর উঠে বসে। ঠিক মাঝখানে একজন গুটিশুটি মেরে নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছে। নিহন সাবধানে তাকে স্পর্শ করতেই মানুষটি ঘুরে তাকাল।
নিহন চাপা স্বরে বলল, 'কাটুস্কা!'
কাটুস্কার মুখে হাসি ফুটে ওঠে, ফিসফিস করে বলল, 'তুমি এসেছ? আমি ভেবেছিলাম তুমি আর কোনোদিন আসবে না। ভেবেছিলাম তোমাকে আর না দেখেই আমি মরে যাব।'
'কী বলছ তুমি?'
কাটুস্কা তার হাতটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'নিহন।'
'বলো, কাটুস্কা।'
'তুমি আমাকে একবার ধরো। আমি কত দিন এই নৌকায় একা একা শুয়ে আছি। তোমাকে দেখার জন্য আমি কত দূর থেকে এসেছি।'
নিহন এগিয়ে গিয়ে কাটুস্কার হাতটি স্পর্শ করল, শীর্ণ দুর্বল হাত। এই মেয়েটি না জানি কত দিন থেকে এই ছোট নৌকাটিতে ভেসে বেড়াচ্ছে!
কাটুস্কা ফিসফিস করে বলল, 'নিহন, আমি শুধু একটিবার তোমার মতো জলমানব হতে চাই। শুধু একটিবার তোমার মতো জলমানব হতে চাই। শুধু একটিবার একটা ডলফিনের পিঠে বসে সমুদ্রের পানিতে ছুটে যেতে চাই। শুধু একটিবার–'
নিহন গভীর ভালোবাসায় কাটুস্কাকে বুকে জড়িয়ে ধরে নরম গলায় বলল, 'কাটুস্কা! একটিবার নয়, তুমি অনন্তকাল আমাদের জলমানব হয়ে থাকবে।'
কাটুস্কার চোখ হঠাৎ সজল হয়ে ওঠে। সে ফিসফিস করে বলে, 'তুমি আর কোনোদিন আমাকে ছেড়ে যাবে না তো?'
নিহন মাথা নাড়ল, বলল, 'না, ছেড়ে যাব না। কোনো দিন ছেড়ে যাব না।'

Why not come our chat room

& have some great time..........